KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ১৩ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড,
Collection : KLMLGK	Publisher : বিক্রম মুখোপাধ্যায়
Title : পত্রিকা	Size : 6" x 9.5" 15.24 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : 2/1 2/2 2/3-4 2/5	Year of Publication : আশ্বিন, ১৩৮৭ কার্তিক, ১৩৮৭ অগ্রহায়ণ, পৌষ - ১৩৮৭ মাঘ, ১৩৮৭
	Condition : Brittle ✓ / Good
Editor : বিক্রম মুখোপাধ্যায়, বিজনারায় চৌধুরী	Remarks : No. of Page missing

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পত্রিকা

সংস্কৃতি ও প্রগতির মাসিক মুখপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩৪৭

চাহার দরবেশ

প্রমথ চৌধুরী

বি. এন. আর. যখন প্রথম খোলে, তার কিছুদিন পরেই আমি উক্তপথে C. P.-র কোন সহরে যাত্রা করি।

রেলগাড়ী আমি প্রথম দেখি ও তা'তে চড়ি পাঁচ বৎসর বয়সে। যে গাড়ী গরুতে টানে না, ঘোড়ায় টানে না, আপনি চলে—সে গাড়ী দেখে আমি আনন্দে অধীর হইনি।

তারপর রেলগাড়ীতে অসংখ্য বার যাতায়াত করেছি। কিন্তু এই C. P. যাত্রার পথে একটু নতুনত্ব ছিল—সেই কথাই আজ বলব।

কলকাতা থেকে আসানসোলে যাই—আর বোধহয় সেখানেই ই. আই. আর.-এর গাড়ী ছেড়ে বি. এন. আর.-এর গাড়ীতে চড়ি।

রাত্তিরে কোন হোটেলে এসে ডিনার খেতে পাব—আশা করি। আমি ভোজন-বিলাসী নই। চব্বিশ ঘণ্টা উপবাস করলেও আমার নাড়ী ছেড়ে যায় না—এমন কি পিত্তিও পড়ে না। তাহ'লেও রাত্তিরে কিছু খাওয়া আমার অভ্যাস ছিল। সেই জন্যই ডিনারের আশায় গাড়ীতে বসেছিলুম।

পুরুলিয়া ছাড়বার ঘণ্টা দুয়েক পর আমি গাড়ীর চালচলন দেখে অবাক হয়ে গেলুম। গরুর গাড়ীর চাইতে সে গাড়ীর চলন কিছু দ্রুত নয়। মধ্যে মধ্যে গাড়ীটা পা টিপে টিপে চলে যেতে আরম্ভ করলে। আমি ছিলুম সেকেণ্ডক্লাসের যাত্রী—আর আমার সহযাত্রী ছিলেন একটি রেল-কর্ম্মচারী। রেলের এই বিলম্বিত চাল সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন,—এ দেশের মাটি Black Cotton soil বলে রেলের রাস্তা আজও consolidated হয় নি, তাই সাবধানে যেতে হয়।

গরুর গাড়ী যদি রেলগাড়ীর মত দৌড়য়, তাহলে তার আরোহীদের ভয় হওয়া স্বাভাবিক। অপরপক্ষে রেলগাড়ী যদি গরুর গাড়ীর মন্দগতিতে চলে, তাহলে সে গাড়ীর আরোহীদেরও মন প্রসন্ন হয় না। আমি এই অচল ট্রেনে বসে বসে ঈষৎ কাতর হয়ে

পড়লুম। আমার সহযাত্রীটি ছিলেন নিম্নশ্রেণীর ইংরাজ, কিন্তু কথায়বার্ত্তায় ভদ্র। তিনিও একটি ছোট ষ্টেশনে নেমে গেলেন, যেখানে তাঁর বাসস্থানে তাঁর মেম ছিল ও খানাপিনা ছিল।

তারপর সারা রাত্তির গাড়ী খোঁড়াতে খোঁড়াতে, হাঁপাতে, হাঁপাতে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে অগ্রসর হ'তে লাগল। প্রতি ষ্টেশনে এঞ্জিনের দম জিরতে ও একপেট জল খেতে অন্ততঃ আধঘণ্টা লাগল।

পথিমধ্যে খোঁজ করে জানলুম যে, চক্রধরপুরে অন্ততঃ এক পেয়ালা চা পাব।

তার পরদিন সকালে অর্থাৎ বেলা বারোটায় চক্রধরপুর পৌছলুম। কিন্তু সেখানেও এক পেয়ালা চা মিল্‌ল না। আমি চা-খোর নই, কিন্তু সকালে এক পেয়ালা চা না পেলে ভীষণ অসোয়াস্তি অনুভব করি।

সে যাই হোক্, চক্রধরপুরে দু'টি ভদ্রলোক এসে আমার গাড়ীতে চড়লেন ; তার ভিতর একজন যেমন বেঁটে, অন্যটি তেমনি লম্বা। বেঁটে ভদ্রলোকের গায়ে আলপাকার কোট ও জিনের পেণ্টলুন, মাথায় একটী বনাতের গোলটুপি, হাতে একটি ছোট ব্যাগ। লম্বা ভদ্রলোকের পরণে লংক্লথের চুড়িদার পায়জামা, আজানুলম্বিত গরম কোট আর মাথায় স্বরচিত পাগড়ী। লম্বা লোকটিকে দেখে প্রথমে নজরে পড়ল—তাঁর চোখ। এমন প্রকাণ্ড, এমন হাঁ-করা চোখ মানুষের মুখে ইতিপূর্ব্বে দেখিনি। তারপর মনে হ'ল সে-চোখ আলাপী চোখ—অর্থাৎ কথা কয়। তার পরেই প্রমাণ পেলুম ভদ্রলোক চোখেমুখে কথা কন—আর সে কথার স্রোত আমাদের রেলগাড়ীর চাইতে দ্রুত। তিনি কামরাতে ঢুকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

—কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?

—কলকাতা।

—কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

—রায়পুর।

—মহাশয়ের নাম ?

আমি আমার নাম বল্লুম। তিনি তা শুনে বল্লেন,—"চৌধুরী" যে কোন্ জাত,—তা' জানা যায় না।

আমি বল্লুম—ব্রাহ্মণ।

—ব্রাহ্মণেভ্যঃ নমঃ।

তারপর বেঁটে ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করলেন :

—মহাশয়ের নাম ?

—পতিরাম পাণ্ডা।

—কি বল্‌লেন ?

—পাণ্ডা।

—আমি শুনেছিলুম পাঞ্জাবী। আপনার পাঞ্জাবীর মত চেহারাও নয়, বেশও নয়। মহাশয় ব্রাহ্মণ ?

—না।

—বাঁচালেন। তিন ব্রাহ্মণে একত্র যাত্রা করা নিরাপদ নয়। মহাশয়ের বাড়ী কোথায় ?

—বাঁকুড়া জেলায়।

—কি করা হয় ?

—ডাক্তারী ?

—এম. বি. ?

—না, আমি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।

—এই বুনোর দেশে ডাক্তারী ব্যবসা চলে ?

—চলে' ত যাচ্ছে।

—ওষুধ ত আপনাদের হয় এক ফোঁটা জল, নয় তিলপ্রমাণ বড়ি।

—ওষুধের গুণ কি তার পরিমাণের উপর নির্ভর করে ?

—অবশ্য নয়। সব গুণী লোক ত তালগাছের মত লম্বা হয় না।

—সে যাই হোক, মশায়ের নাম কি, জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

—সরদার শরকেল।

—বাঙলা ত আপনি আমাদের মতই বলেন।

—তার কারণ, আমিও বাঙালী।

—আমি ভেবেছিলুম বুঝি পাঞ্জাবী, আপনার চেহারা দেখে ও বেশভূষা দেখে, তারপর আপনার নাম শুনে—।

—আমার নাম শ্রীধর সরখেল। খোট্টাদের মুখ থেকে শ্রীধর বেরোয় না, তাই ওরা সরদার বলে, আর সরখেলকে বলে শরকেল—।

—আপনার বাড়ী কোথায় ?

—বর্দ্ধমান জেলায়, কুলীন গ্রামে।

—মহাশয় ব্রাহ্মণ ?

—শুধু ব্রাহ্মণ নয়, একেবারে নৈকষ্য কুলীন। ইচ্ছে করলে ৩৬৫টি বিয়ে করতে

পারতুম, আর পুরো বছর ৩৬৫টি শ্বশুরবাড়ী নিমন্ত্রণ খেয়ে কাটাতে পারতুম—।

—বিয়ে ক'টি ক'রেছেন ?

—একটিও না। বাঁশবনে ডোম কানা।

—কি করা হয় ?

—কিছুই নয়। আমি এখন ভবঘুরে।

—আগে কি করতেন ?

—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। তার অর্থ, কি যে করিনি বলা শক্ত।

—আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনে।

—বুঝতে পারবেনও না। আমি ছিলুম পল্টনে।

—সেপাই ?

—না। Camp follower.

—তাদের কাজ কি ?

—তার কোনও লেখাজোখা নেই। ক্ষেত্রে কার্য্য বিধীয়তে। কখনও পাচক-ব্রাহ্মণ, সেপাইদের বিয়ে শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য, কখনও রসদ কেনা, কখনও খাতা লেখা—ইত্যাদি, ইত্যাদি। একটি শিখ পল্টন আমাদের গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমার বয়স চোদ্দ বৎসর। তাদের সঙ্গেই আমি জুটে যাই। আর কুচ করতে করতে লাহোর যাই। তারপর চল্লিশ বৎসর তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। পল্টনের একটা নেশা আছে, সেই নেশাই আমাকে পেয়ে বসেছিল। এতদিনে সে নেশা ছুটেছে।

—আপনি নেহাৎ ছোক্‌রা বয়সেই পল্টনে ভর্ত্তি হলেন ?

—আমি ত ছোক্‌রা, Camp followerদের মধ্যে দেদার স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত থাকে। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ অতি সুন্দরী, তারা কর্ণেল সাহেবদের প্রিয়পাত্রী হয়।

—আপনি এখন বুঝি পেন্‌সন্ নিয়েছেন ?

—আমার চাক্‌রীর পেন্‌সন্ নেই। চাক্‌রী থাকতে যা রোজগার করতে পারো। আর মাইনে যদিচ নামমাত্র, উপ্‌রি পাওনা বেহিসেবী।

—কিরকম ?

—যুদ্ধের সময় লুট, আর শান্তির সময় চুরি। হিন্দুস্থানীতে একটি কথা আছে—সরকারকে মাল, দরিয়ামে ঢাল্। এ দরিয়া হচ্ছে Army, আর আমরা Camp-followerরা সেই বেহিসেবী খরচের ভাগ পাই। আমি এই খাতে দেদার রোজগার করেছি।

—তাই আপনারা পেন্‌সনের তোয়াক্কা রাখেন না।

—এই ছুটো চাকরীর আয়ও যেমন, ব্যয়ও তেম্‌নি। আমরা মরণের যাত্রী সব বেপরোয়া। ফলে, এখন আমার বিশেষ কিছু নেই। তাই এ জঙ্গলে এসেছি। বুনো রাজাদের ঘাড় ভেঙে কিছু আদায় করতে পারি কিনা দেখতে।

—কি কাজ খুঁজ্‌ছেন ?

—এক ডাক্তারি ছাড়া, যে কাজ জোটে তাই করতে পারি। এমন কি গুরুগিরি পর্য্যন্ত। হিমালয়ে যোগ অভ্যাস করেছি।

চক্রধরপুরেও এক পেয়ালা চা পেলুম না, কিন্তু শ্রীধরবাবুর সত্যমিথ্যা গল্প শুনে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গিয়েছিলুম। শেষটা তিনি বললেন, "আর তিনচার ঘণ্টা বসে আঙুল চুষুন—ঝাড়সুগ্‌ড়ায় গিয়ে চা, রুটি, মাখন সব জোগাড় করে দেব। ষ্টেশন-মাষ্টার আমাদের regiment-এ soldier ছিলেন—আমরা এক সান্‌থির ইয়ার। লোকটা যেমন অসম্ভব লড়িয়ে, তেমনি অসম্ভব ভাল লোক।"

বেলা চারটেয় আমার চব্বিশ ঘণ্টার নির্জ্জলা উপবাস শেষ হবে শুনে একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লুম।

শ্রীধরবাবু বকেই চললেন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে; আর তাঁর কাছে এদেশের রাজাদের বিষয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেন। ডাক্তারবাবুর নাকি এই রাজারাজড়াদের মধ্যেই প্র্যাক্‌টিস্ বেশি। কারণ তাঁরা দিনে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি খান,—কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ তাঁদের সহ্য হয় না—বেশি কড়া বলে'। আর তাঁরা নাকি সব গরু, গাধা ও বোকা পাঁঠা—আর শিকার করেন গেরস্তের ঝি-বউ। আর তাঁদের সহায় রাজমন্ত্রী ও রাজ-পুরোহিত।

বেলা চারটেয় গাড়ী ঝাড়সুগ্‌ড়া ষ্টেশনে পৌছল, আর শ্রীধরবাবুর আদেশে তাঁর সঙ্গে আমি প্ল্যাটফর্‌মে নামলুম। তিনি বললেন,—আপনি খানাকাম্‌রায় ঢুকুন, আমি ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে একটা কথা কয়ে আসছি।

খানাকাম্‌রায় ঢুকে আমি তাঁর মাদ্রাজী ম্যানেজারকে চা ও রুটিমাখনের অর্ডার দিলুম। সে বললে,—কিছুই নেই, সব বিক্রী হ'য়ে গেছে।

আমি অগত্যা শ্রীধরবাবু গোরা ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে যেখানে কথোপকথন করছিলেন, সেইখানে গেলুম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "চা পেলেন ?"—আমি বললুম, "না।"

শ্রীধরবাবু ষ্টেশন মাষ্টারকে পল্টনী ইংরাজীতে আমার দুরবস্থার কথা বললেন। তিনি তখনই শ্রীধরবাবুকে হুকুম দিলেন, "শালা মাদ্রাজীকো কান পাকড়কে লে আও।"

শ্রীধরবাবু অমনি খানাকাম্‌রায় ঢুকে ম্যানেজারের কান ধরে নিয়ে এলেন।

সাহেব হুকুম দিলেন যে, চা বানাও, আর ক্ষটিমাখন বাবুকে দাও।

মাদ্রাজী বললে, "নেই হ্যায়!"

—সরদারজী! উস্‌কো এক থাপ্পড় লাগাও, আওর আলমারী খোলো। শালা চোর হ্যায়।

শেষে সবই পেলুম ও খেলুম।

গাড়ীতে ফেরবার পথে শ্রীধরবাবু বললেন, "ষ্টেশন মাষ্টারকে জানালুম যে সঙ্গে টিকিট নেই—গার্ডকে বলে দেবেন, রাস্তায় কেউ যেন উৎপাত না করে। তিনি বললেন, alright. আর ওই মাদ্রাজীটা এক টাকার জিনিষ আপনার কাছে দু'টাকা নেবার ফন্দী করেছিল। এক থাপ্পড়ে বিনা পয়সায় হ'য়ে গেল। এরি নাম পল্টনী কায়দা।"

গাড়ীতে ঢুক্কে দেখি দু'টি নতুন ভদ্রলোক বসে আছেন। দু'জনেরই পরণে ইংরাজী পোষাক;—একজনের চাঁদনির তৈরী, আর একজনের ব্রিচেস-পরা আর হাঁটু পর্য্যন্ত পট্টি জড়ানো।

শ্রীধরবাবু গাড়ীতে উঠেই জেরা সুরু করলেন। তার ফলে আমরা জানলুম একজনের নাম তারক তলাপাত্র—Timber merchant. আর যাঁর বেশ ঘোড়-সোয়ারের মত, তিনি হচ্ছেন Forest officer, নাম সুষেণ সেন। তাঁর পৈতৃক উপাধি ছিল দাস, তিনি অনুপ্রাসের খাতিরে সেন অঙ্গীকার করেছেন।

তারপর ঘণ্টা তিন-চার ধরে শ্রীধরবাবু মজলিস জমিয়ে রাখলেন। এমন অনর্গল বকতে আমি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কখনো দেখিনি। তিনি জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করেছেন, তাই তিনি নতুন যাত্রীদের ব্যবসার বিষয় সব জানেন। তিনিও কিছুদিন কাঠের ব্যবসা করেছিলেন,—যেখানে হিমালয়ের গায়ে প্রকাণ্ড শালবন আছে, আর তার মধ্যে মধ্যে ছোটখাটো নদী—যার বর্ষাকালে হয় অসম্ভব তোড়। বড় বড় শালগাছ কেটে সেই নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে হয়, যেখানে গিয়ে সেই গুঁড়িগুলো ঠেকে, সেখানে সেগুলি জল থেকে তুলে বেচতে হয়। এ ব্যবসায়ে লাভ খুব বেশী। কিন্তু কোন্‌টা কা'র গুঁড়ি, এই নিয়ে ঝগড়া হয়—আর এই ঝগড়াঝাঁটিতে লাভ সব খেঁয়ে যায়। শ্রীধরবাবু বল্লেন,—তা যদি না হ'ত, তাহলে আমি আজ লক্ষপতি হতুম। একা মানুষ, তাই আমি পয়সার জন্য কেয়ার করতুম না। হিমালয়ের ট্যাঁকে-গোঁজা ছোট-ছোট রাজ্যের রাজারা সব রাজপুত আর সকলেই আফিংখোর। এদের আদালত আছে, কিন্তু আইন-কানুন নেই। এদের বিচারপ্রার্থী হওয়া ঝক্‌মারী।

তারকবাবু বললেন,—লোকে কাজ কি শুধু স্ত্রীপুত্রের জন্য করে! আমার

স্ত্রী-পুত্র নেই। ডাক্তারবাবু বল্লেন, তাঁরও নেই। Forest officer বল্লেন, তাঁরও নেই।

সহযাত্রীদের কারও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নেই শুনে শ্রীধরবাবু সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হলেন, তা তাঁর বক্তৃতায় বোঝা গেল না। তিনি শুধু বললেন,—"আপনারা সকলেই দেখছি টিনির বলদ। টাকার বোঝা ব'য়ে বেড়াচ্ছেন।" তিনিও অবিবাহিত, কিন্তু তাঁর যেমন কামিনী নেই, তেমনি কাঞ্চনও নেই। ভূতের ব্যাগার খাটা তাঁর ধাতে নেই। তারপর তিনি গেরস্ত লোকের যে বিবাহ করা উচিত, সে বিষয়ে নানা যুক্তি দেখালেন। তাঁর কথায় কেউ বিশেষ আপত্তি করলেন না। কিন্তু সকলেই আলোচনায় যোগ দিলেন। বিবাহ জিনিষটা এদেশে জন্ম-মৃত্যুর মত নিত্য হয়, এ বিষয়ে যে এত মতভেদ আছে তা জানতুম না। আমি একমনে এই সব তর্ক-বিতর্ক শুনছি, এমন সময় বাঁ দিকে একটি বেজায় ফাঁপা ও ফুলো নদী দেখতে পেলুম—তার নাম বোধহয় মহানদী। বর্ষায় তার এই চেহারা, গ্রীষ্মে কিন্তু এ নদীতে কোমর-জল থাকে না। ডাক্তারবাবু বললেন যে, রাতভর হয়ত তীরে বসে ঢেউ গুনতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন? তিনি উত্তর করলেন,—এ রেলগাড়ী গরুর গাড়ী হতে পারে, কিন্তু জাহাজ নয়। আর ঘোড়া পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তারা সিন্ধু-ঘোটক নয়।

ডাক্তারবাবু যা বলেছিলেন, তাই ঘট্‌ল। রাত্তির প্রায় সাড়ে আটটায় রায়গড় ষ্টেশনে পৌঁছে শুনলুম যে, সে রাত্তির আর গাড়ি এগোবে না। এর পরের রাস্তা বানের জলে ডুবেছে ও সম্ভবতঃ বিপর্য্যস্ত হয়েছে। রাস্তা যদি কোথাও বেমেরামত হয়ে থাকে, আজ রাত্তিরেই তা মেরামত হয়ে যাবে। অগত্যা আমরা কি করে রাত কাটাব, সেই ভাবনাতে অস্থির হয়ে পড়লুম।

ষ্টেশন মাষ্টার ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী বললেন,—আমি দু'একখানা বেঞ্চি জোগাড় করে দিচ্ছি, তাতেই পালা করে রাত কাটাতে পারবেন। অবশ্য আপনাদের কষ্ট হবে! কিন্তু উপায় নেই।

শ্রীধরবাবু বললেন যে,—যাত্রা শুনেও ত সারারাত জেগে কাটানো যায়। এ যাত্রা আমরা বকে ও গল্প করে রাত কাবার করে দেব। কি বলেন বনবিহারীবাবু?

Forest officer বললেন,—তার আর সন্দেহ কি?

তারপর শ্রীধরবাবু ষ্টেশনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন,—খাবার কিছু পাওয়া যায়?

ষ্টেশনবাবু বললেন,—দেদার ভুট্টা।

—তাই আনিয়ে দিন।

ডাক্তারবাবু বললেন,—পোড়াবে কে?

Forestবাবু বললেন,—আমার চাকর গোপাল।

ভুট্টা এল। পোড়ানো হল। শ্রীধরবাবু বললেন,—এক বোতল Rum থাকলে ভুট্টার চাটের সঙ্গে খাওয়া যেত।

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন,—আপনি Rum খান নাকি?

—আমি পল্টনে চাকরি করতুম, মদ-মাংস খেয়েই মানুষ। পল্টনে কেউ হবিষ্যি করে না। বিলিতি সভ্যতা পঞ্চ-'ম'কারের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

—তা যেন হল। কিন্তু Rum ত অতি খারাপ জিনিষ?

Forestবাবু বললেন,—গোপালের কাছে দু'এক বোতল Whiskey আছে।

শ্রীধরবাবু বললেন,—ব্যোম ভোলানাথ!

গোপাল এক বোতল Whiskeyর ছিপি খুললে।

Forestবাবু বললেন,—থাকি একা বন-জঙ্গলে, বাঘভালুকের মধ্যে। বিদ্যের মধ্যে শিখেছি এইWhiskey খাওয়া।

ডাক্তারবাবু বললেন যে, তিনি হোমিওপ্যাথিক নিয়মে, অর্থাৎ dilute করে খেতে পারেন।

তারকবাবু বললেন, তিনি dilute না করেই গলাধঃকরণ করবেন।

আমিই একা নির্জ্জলা উপবাস করলুম।

অতঃপর আমার সহযাত্রীরা ধীরে-সুস্থে Whiskey পান করতে আর মধ্যে মধ্যে ভুট্টা চিবতে লাগলেন।

শ্রীধরবাবু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারেন না। তিনি হঠাৎ প্রস্তাব করলেন যে, "আমরা সকলেই অবিবাহিত, অবশ্য বিভিন্ন কারণে। কেন আমরা গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করিনি, তারই ইতিহাস বলা যাক্। আমার নিজের কথাই প্রথমে বলছি:

আমি যে বিবাহ করিনি, তাতে আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ নেই। চল্লিশ বৎসর নানা পল্টনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। মধ্যে মধ্যে বেশ পয়সাও রোজগার করি। কিন্তু সে রোজগার অনিশ্চিত। তাই বহু স্ত্রীলোক দেখেছি, কিন্তু তাদের কাউকেও বিয়ে করবার কথা কখনো মনে হয়নি। পল্টনে অবশ্য বিয়ে হয়, কিন্তু সে বিয়ে নিকে ও ঠিকে মাত্র। ও একরকম গান্ধর্ব্ব বিবাহ যার ভিতর জাতবিচার নেই, দেনা-পাওনা নেই। এমন কি সৈনিকের দৈনিক বিবাহও চলে।

আমি কুলীনের ছেলে, বহু-বিবাহে আমার আপত্তি নেই। আমরা বিবাহ করি কুলীন-কন্যাদের কুল রক্ষা করবার জন্য, কিন্তু তা'তে তাদের শীল রক্ষা হয় না। আমরা বিবাহ করেই খালাস—তারাও তাই। আমাদের ওই শ্রেণীর স্ত্রীদের বিশেষ-

রূপে বহন করতে হয় না। তারা luggage নয়। আর luggage ঘাড়ে করে পল্টনের Camp follower হওয়া যায় না। এখন বুঝলেন, আমি কিসের জন্য চির-কুমার। বয়স যখন পঞ্চাশ পেরলো, তখন আমি পল্টন থেকে আলগা হলুম। কিছু টাকা হাতে করে দেশে ফিরিনি, হিমালয়েই থেকে গেলুম—কখনও Dalhousie ও কখনও Simlaয়।

এই সময় আমার এক ভাইপো আমার এক বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠালেন। আমি উত্তরে তাঁকে লিখলুম—গতা বহুতরা কান্তা, স্বল্প তিষ্ঠতি শর্ব্বরী।—এই ত শুনলেন আমার ইতিহাস! চৌধুরী মশায়, আপনি অবশ্য এখনও বিয়ে করেন নি। আপনি কলেজের ছোকরা। আমার পরামর্শ শোনেন ত বাড়ী ফিরেই বিয়ে করুন।"

এর পর ডাক্তারবাবু তাঁর আত্মজীবন-চরিত বলতে সুরু করলেন:

"আমার বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়। আমি ব্রাহ্মণ নই; যদি হতুম ত পাচক-ব্রাহ্মণ হতুম। আমাদের পারিবারিক ব্যবসা ডাক্তারি। অ্যালোপ্যাথি নয়, হোমিওপ্যাথিও নয়—হাতুড়েপ্যাথি। আজকাল হাতুড়েপ্যাথির ব্যবসা চলে না। তাই কাকার পরা-মর্শে হোমিওপ্যাথির একখানা বাঙলা বই মুখস্থ করে ডাক্তারি সুরু করলুম। প্রথমে গাঁয়ে। আমাদের একটা বদনাম আছে, আমরা নাকি হামবড়ামি করি। Baileyর ভাই Kelly যে রোগ সারাতে পারে না, আমরা নাকি এক ফোঁটা ওষুধে তা সারাই। কিন্তু আমরা নিজের বিদ্যের বড়াই করিনে, আমাদের ওষুধের গুণগান করি।

আমি ব্যবসা সুরু করলুম। আমারি কাকা আমার বিয়ে স্থির করলেন একজন মোক্তারের মেয়ের সঙ্গে। মেয়ে দেখে আমি ভড়্‌কে গেলুম। কাকা কিন্তু নাছোড়বন্দা—টাকাটা সিকেটার লোভে। মেয়ের হল ওলাউঠো—আমি বললুম, আমি এক বড়িতে সারিয়ে দেব। আমিও বড়ি খাওয়ালুম, সেও মারা গেল।

মোক্তারবাবু বললেন যে, আমি বিষবড়ি খাইয়ে তাকে মেরেছি। এর পর গাঁয়ের লোক রটালে যে, আমি খুনে ডাক্তার। বেগতিক দেখে আমি দেশ থেকে পলায়ন করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলুম। সেই অবধি এই বুনো দেশে আমাদের ছোট ছোট সাদা বড়ি দিয়ে চিকিৎসা করছি, আর তাতেই খোরপোষ চলে যাচ্ছে। যে যাই বলুন ঐ নিরীহ বড়ির তুল্য ওষুধ আর নেই।"

এক গুলি হোমিওপ্যাথিক ওষুধে যে লোক মারা যায়—এ কথা শুনে সকলেই অবাক হয়ে গেলেন। একমাত্র শ্রীধরবাবু বললেন যে, তিনি এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ওষুধ গিলতে প্রস্তুত।

তারপর তারকবাবু বললেন:

"এখন আমার কথা শুনুন। আমার দাদা রেলওয়েতে চাকরি করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন পরমাসুন্দরী। তিনি একদিন হঠাৎ heart failure-এ মারা গেলেন—কিন্তু দাদাকে ছেড়ে গেলেন না। যখনতখন দাদার সুমুখে এসে উপস্থিত হতেন, কিন্তু কোনও কথা কইতেন না। দাদা তাঁর স্ত্রীর প্রেতাত্মার উৎপাতে প্রায় পাগল হ'য়ে উঠলেন। আর আমাদের সকলকেই প্রায় পাগল করে তুললেন। আমরা গয়ায় প্রেতশিলায় বৌদিদির শ্রাদ্ধ করলুম। কিন্তু পারলৌকিক বৌদিদি দাদাকে ছাড়লেন না। এমন কি, দাদা ট্রেনে যাচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর স্ত্রী এসে তাঁর কাছে আবির্ভূত হলেন। তিনি অমনি ভয়ে চীৎকার করতে সুরু করলেন। শেষটা তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন, এবং দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলেন। কিছুদিন পরে তিনিও মারা গেলেন। আমি তাঁর সঙ্গেই ঘুরতুম, কিন্তু কখনও তাঁর স্ত্রীর ছায়া দেখিনি। দেখেছি শুধু দাদার অসাধারণ কষ্ট। ডাক্তাররা বললে যে, দাদার যা হয়েছে তা mental disease. যদি তাই হয়ত mental disease যে কি ভয়ঙ্কর বস্তু, তা বলা যায় না। এই ব্যাপারে আমার মনে যে ধাক্কা লেগেছিল, তা'তে বিয়ের নাম শুনলে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। সেই ধাক্কায় আমি চিরকুমার।"

শ্রীধরবাবু বললেন, "monogamyতে এই বিপদ। বহুবিবাহের বিপদ নেই। আপনারা বুঝি কুলীন নন, তাতেই আপনার দাদা এই ঘোর বিপদে পড়েছিলেন।" অন্য কেউ রা কাড়লেন না।

শেষটা বনবিহারীবাবু বললেন :

"আমার বিয়ে না করবার কারণ আরও অদ্ভুত। আমার বাবা ছিলেন একজন বড় Forest officer, তিনিই সাহেবদের বলে কয়ে আমাকে এ চাকরিতে বাহাল করেন। আমি ছিলুম Rangaroon Forest-এর Officer. ঐ প্রকাণ্ড বনের ভিতর একটা ছোট্ট Inspection Bungalow আছে। মধ্যে মধ্যে আমাকে সেখানে গিয়ে দু'তিন রাত কাটাতে হ'ত। সে বাঙলোর খবরদারী করত একটি বৃদ্ধ নেপালী, আর তার সঙ্গে থাকত তার একটি নাত্‌নী। অমন সুন্দরী মেয়ে আমি আর কখনও দেখিনি। রং ফরসা, আর নাকচোখ বাঙালীর মত। আমার তখন যাকে বলে প্রথম যৌবন। তাই আমি সেই মেয়েটীকে বিবাহ করব স্থির করলুম। তারপর শুনলুম যে, সে পূর্ব্ব-অফিসার দাস সাহেবের মেয়ে। দাস সাহেব হচ্ছেন আমার পিতা। এ কথা শুনে আমি গভর্ণমেণ্টের চাকরী ইস্তফা দিয়ে চলে আসি। তারপর এ অঞ্চলের একটি রাজার forest অফিসার হয়েছি। এর পর থেকে বিয়ের নাম শুনলে আমার গা-পাক দিয়ে ওঠে।"

চার চিরকুমারের চারটি গল্প শুনে শ্রীধরবাবু বললেন,—এখানে যদি কোনও লেখক থাকত ত এই চারটি গল্প লিখলে একখানি নতুন চাহার দরবেশ হ'ত।

ডাক্তারবাবু বললেন যে, আমরা ত দরবেশ নই।

শ্রীধরবাবু উত্তর করলেন—যে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করে, সেই দরবেশ। আমার ও দুই নেই। আপনারা অবশ্য এখনও কাঞ্চন ছাড়েন নি। ও শুধু ভূতের ব্যাগার খাটা। শুনতে পাই যে শাস্ত্রে বলে, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। যার গৃহিণী নেই তার গৃহও নেই। আর যে গৃহহীন, সেই ত দরবেশ।

আর্ট ও আধুনিক সাহিত্য

অন্নদাশঙ্কর রায়

আপনাদের সৌজন্যের জন্য যুক্তকরে ধন্যবাদ। আমার কাছে এই প্রবীণোচিত সম্মান নিছক আহ্লাদের বিষয় নয়। এতে মনে করিয়ে দেয় যে আমার বয়স হয়েছে, বয়েসের হিসাবে আমি তরুণ নই। বাস্তবিক এটা সে হিসাবে আমার বয়ঃসন্ধি। আমি প্রবীণদের মহলে নবীন, নবীনদের মহলে প্রবীণ। এর ভালোমন্দ দুই-ই আছে। মন্দের উল্লেখ ত করেছি। বয়স হয়েছে এ কথা ভাবতে একটুও ভালো লাগে না, সভাপতির মর্য্যাদা পেলেও না। আমি মনে প্রাণে তরুণ থাকতেই ভালোবাসি। পাকাচুলের উপর আমার চিরকালের বিরাগ। কিন্তু ইতিমধ্যে পাকাচুলের পরোয়ানা পৌঁছে গেছে। সুতরাং আপনাদের পরোয়ানা আর বেশী কী। তার পর ভালোও আছে। নবীন ও প্রবীণ উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি পরস্পরকে পরিচিত করাতে পারি। প্রবীণদের বোঝাতে পারি নবীনরা কী ভাবে—যদিও নবীনদের সঙ্গে আমার পরিচয় অপ্রচুর। আর নবীনদের বোঝাতে পারি প্রবীণদের মনোভাব—যদিও প্রবীণদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ স্বল্প।

আমার আজকের অভিভাষণে আমি এই কাজটিই করব। আধুনিক সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্তি আছে, আমি চেষ্টা করব নিরসনের। আধুনিকদের কাছে অত্যাধুনিকদের নানা জিজ্ঞাসা আছে, আমি উত্তরদানের চেষ্টা করব। এই দুই কর্ত্তব্য একসঙ্গে করা হয় যদি অভিভাষণটিকে কাহিনীর আকার দিই। জানি তা এখানকার রীতি নয়। তবু আমার আশা আছে আপনারা মার্জ্জনা করবেন।

আমি যার কাহিনী বলতে যাচ্ছি তার নাম দেওয়া যাক বিনু। বিনু যখন খুব ছোট তখন তার বাবা তাকে এক আলমারী বই দিয়ে বললেন, এখন থেকে তোর কাছে রইল এর চাবি। বিনু যেন স্বর্গ হাতে পেল। বইগুলি পড়ে বোঝবার মত বিদ্যা তার ছিল না, তবু দিনরাত নাড়াচাড়া করত। বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ছোট বড় কত রকম বই। হঠাৎ একদিন সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল গৃহদাহে। বিনুর সে কী দুঃখ। তার পর তার কাকা তাকে আনিয়ে দিলেন একখানা শিশু মাসিক। তা পড়ে তার সখ গেল সেও মাসিকপত্র চালাবে। হাতে লিখে বের করল একখানা নকল মাসিক। তাতে বিজ্ঞাপনেরও নকল থাকত। ত্রিবর্ণ আর একবর্ণ চিত্র বিনু

নিজে আঁকত। গল্প আর কবিতা, নাটক আর উপন্যাস অভাব ছিল না কিছুরই। অভাব ছিল শুধু পাঠকের।

এমনি করে তার সাহিত্যচর্চ্চার হাতেখড়ি হল। তারপর এক শুভদিনে স্কুলের ছেলেদের সমিতির আলমারি পড়ল বিনুর হাতে। বিনু ক্লাস পালিয়ে সমিতির ঘরে ঢুকত, আলমারি খুলে কেবল মাসিকপত্র পড়ত। তখনকার দিনের প্রায় সব ক'টি মাসিক নেওয়া হ'ত বিনুদের স্কুলে। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, নারায়ণ, মানসী ও মর্ম্মবাণী ইত্যাদি ছিলই। আশ্চর্য্যের কথা—ছিল সবুজপত্র। হেডমাষ্টার মশাই কী ভেবে ও কাগজ আনিয়েছিলেন তা তিনিই জানতেন, ছেলেদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র বিনুই ও কাগজ পড়ত। আর বিনুও যে ওর একবিন্দু বুঝত তা নয়, কতই বা তখন তার বয়স, বারো কিম্বা তেরো। তবু সেই বয়সেই তার ভালো লাগত বীরবলের ষ্টাইল, আর তাঁর রসিকতা। তখন থেকে মনে মনে সে তাঁর একলব্য।

কিন্তু এই সব পড়াশুনার সদ্য ফল কিছুমাত্র ছিল না। বিনুর লেখা বন্ধ হয়ে গেছল, কেননা পরের নকল করতে তার উৎসাহ ছিল না। সে প্রায় সমস্তক্ষণ পড়ত। তাও পাঠ্যপুস্তক নয়, এই সব মাসিকপত্র ও সাহিত্য গ্রন্থ। ইংরাজী মাসিকপত্র পড়তে পড়তে সে চলে গেল আর এক রাজ্যে। ভাবতে থাকল কী করে একদিন জাহাজের খালাসী হয়ে দেশান্তরে পালাবে। তার পর ইংরাজী সংবাদপত্র পড়তে পড়তে তার দৃষ্টি পড়ল রাজনীতির উপর। অমৃতসর, গান্ধী, খিলাফৎ। এ সকলের ঠিক মানে বোঝবার মত বয়স তার হয়নি, কিন্তু তারও ইচ্ছা যেত দেশের কাজ করতে। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তার ধারণা জন্মিয়েছিল সেও অমন আগুনভরা প্রবন্ধ লিখতে পারে, সেও বানাতে পারে অমন এক একটি কাগজের বোমা। বিনু একদিন সত্যি সত্যি এসে কলকাতার রাজপথে হাঁটাহাঁটি সুরু করে দিল। উদ্দেশ্য সংবাদপত্রের আফিসে ঢুকে দেশ উদ্ধার। কিম্বা খালাসী হয়ে জাহাজে চড়ে আমেরিকাযাত্রা। দুটোর কোনোটাই হল না। কারণ সম্পাদকরা হৃদয়হীন। একজন বললেন, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে চাও, বেশ কথা। কিন্তু তার আগে শিখে রাখতে হয় প্রুফ দেখা। প্রুফ দেখে বিনুর চক্ষু স্থির। আর একজন বললেন, আগে শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং, তার পরে জর্নালিজম। শর্টহ্যাণ্ড শিখতে গিয়ে বিনুর কান্না পেল। কোথায় কাগজের বোমা, অগ্নিবর্ষী কামান। আর কোথায় সরু সরু দাঁড়ি আর ডট। জাহাজের দিকে তাকিয়ে বিনুর বুক কাঁপে। সাত সমুদ্র তেরো নদী। একবার খালাসী হলে কি খালাস আছে।

কলেজে ভর্ত্তি হয়ে বিনু ছেড়ে দিল পথটা। অসহযোগীরা অধিকাংশই ফির-

ছিলেন, সুতরাং গোলামখানায় কে কাকে লজ্জা দেবে। তবু সেই পশ্চাদ্ অপসরণের গ্লানি বিনুকে জর্জরিত করেছিল। সে সাহিত্য-টাহিত্য বহুদিন ভুলেছিল, নতুন করে পড়তে সুরু করল। এবার সে পড়ল বেশীরভাগ বিদেশী বই। ইবসেন, বার্নার্ড শ, টলষ্টয়, টুর্গেনিভ, ডষ্টইয়েভস্কি। বিশুদ্ধ সাহিত্য তাকে আকর্ষণ করল না, সাহিত্যের মধ্যে সে খুঁজল Social significance—সামাজিক সার্থকতা, সমাজ সংস্কার, সমাজের পুনর্গঠন, নানা বিচিত্র সমস্যার সমাধান, এইসব তাকে আকুল করল। সে যদি কোনো দিন কলম হাতে নেয় তবে সেই কলম হবে তার তলোয়ার, তাই দিয়ে সে কালাপাহাড়ী করবে। এই হল তার তখনকার স্বপ্ন। দু' একটি চোখা চোখা প্রবন্ধ লিখে সে সাধু সজ্জনদের ভয় পাইয়ে দিল। হয়ত আরো লিখত ওধরণের লেখা। কিন্তু ভাগ্যদেবতার চক্রান্ত চলছিল তাকে সাহিত্যিক করবার। বিনু প্রেমে পড়ল।

বিনুর প্রেমের ইতিহাস বর্ণনা করা অবান্তর। প্রেমে পড়ে বিনুর প্রধান কাজ হল চিঠি লেখা, তার পরে কবিতা লেখা। তিনটি বছর এই নেশায় মশগুল থেকে বিনু আবিষ্কার করল যে তার লেখার হাত আছে। সে সাহিত্যিক। এর জন্যে তাকে শর্টহ্যাণ্ড শিখতে হবে না, প্রুফ দেখতে হবে না, শুধু অন্তরের কথা অন্তরের কাছে পৌছে দিতে হবে। তার লেখনী যেন খেয়া নৌকা। একূল থেকে ওকূলে পার করাই তার কাজ। কাগজের বোমা, কাগজের তলোয়ার কোথায় পড়ে রইল। বিনু হল খেয়ানৌকার পাটনী।

তার সাধনা কথা বলার সাধনা। বোবা সংগ্রাম করছে সবাক হতে। ভাব-প্রকাশের জন্য সংগ্রাম, struggle for expression. পাঠক ত মাত্র একজন। সেই একজনের জন্যে কী অবিশ্রাম উদ্যম! বলতে হবে, বলতে হবে, বলতে হবে। ঠিকমত বলতে হবে, পরিমিতভাবে বলতে হবে, সুষমভাবে বলতে হবে। একটিও শব্দ বেশী হবে না, কম হবে না, অপ্রযুক্ত হবে না। পাঠক যদিও একজন তবু লেখা হবে সকলের সেরা। বিনুর প্রয়াস যাতে তার প্রত্যেকটি কথা হয় পড়বার মত, দু'বার পড়বার মত, আবার পড়বে বলে তুলে রাখবার মত। যে কৌটায় বিনুর প্রাণ আছে সে কি নিতান্ত একখানা চিঠি? সে সাহিত্য, দু'জনের গোপনীয় সাহিত্য।

এর পরে বিনু চলে গেল মথুরায়। তার প্রেমের পরিণতি মাথুর। যাবার আগে তার এই প্রত্যয় জেগেছিল যে সে সাহিত্যিক ছাড়া আর কিছু নয়, সাহিত্য ছাড়া আর সবই তার কাছে পরধর্ম। যে জীবিকা সে অবলম্বন করেছিল তাতে তার মন ছিল না। কী আর করবে! সাহিত্যিক হিসাবে তার আয় এক পয়সাও না, কিন্তু বাঁচতে হলে পয়সা দরকার। সাহিত্যই যদি তার জীবিকা হত তা হলেই

জীবনের সামঞ্জস্য হত। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয় তখন অপর কোনো জীবিকা স্বীকার করতেই হবে, নইলে অনশন। অসামঞ্জস্যের কাঁটা ফুটে থাকল তার মর্মে।

যেদিন জানল যে সে সাহিত্যিক ছাড়া আর কিছুই নয় সেদিন থেকে তাকে পীড়া দিতে থাকল দুটি প্রশ্ন। এক, কিসের জন্যে সাহিত্য? দুই, কাদের জন্যে সাহিত্য?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কেউ বলতেন, জাতীয় ভাবধারায় অবগাহন করে জাতীয় বেশ পরিধান করে বিশ্বসভায় যাতে আসন পায় এই দেশ, পায় শ্রেষ্ঠ আসন, সেইজন্যে সাহিত্য। কেউ বলতেন, শিক্ষার জন্যে, সমাজ সংস্কারের জন্যে, সমাজবিপ্লবের জন্যে, দেশের স্বাধীনতার জন্যে, জনমনের আত্মপ্রকাশের জন্যে। কেউ বা বলতেন, চিত্তশুদ্ধির জন্যে, ভাগবত উপলব্ধির জন্যে, দেবজীবনলাভের জন্যে, নৈতিক উৎকর্ষের জন্যে। এমনি কত কথাই বিনু শুনল। মথুরায় গিয়ে দেখল, ওখানে মানুষকে এমনভাবে ব্যবচ্ছেদ করা হচ্ছে যেন মানুষ বলে কিছু নেই, আছে তার দেহ, তার মন, তার ব্যবহার, তার এলোমেলো চিন্তা ও লাফ দিয়ে চলা স্বপ্ন। আছে তার চেতনাপ্রবাহ, তার অবচেতনা, তার রকমারি কমপ্লেক্স্, তার কত রকম রিফ্লেক্স্ য়্যাক্শন। সাহিত্য বলতে ওখানে কী না বোঝায়! বিনু ত দিশা হারাতে বসল। তখন তার হৃদয় বলে উঠল, না, না, নেতি, নেতি। আর্টের মধ্যে অনেক জিনিষ আসতে পারে, যেমন নৌকার মধ্যে। কিন্তু আর্টকে হতে হবে আর্ট। সাহিত্যকে হতে হবে সাহিত্য। কী করে তা হবে সে কৌশল যারা জানে তারাই সাহিত্যিক, তারাই আর্টিষ্ট। তারা হৃদয়বান, তারা বিদগ্ধ, তারা মানুষকে মানুষ বলেই ভালোবাসে, প্রকৃতিকে প্রকৃতি বলেই। তারা সৃষ্টি করে সৃষ্টির জন্যে, লেখনী দিয়ে খেলনা বানায় খেলার জন্যে। কিসের জন্যে আর্ট? আর্টের জন্যে আর্ট। আর্ট ফর আর্টস সেক। এই উত্তরই আর্টিষ্টের উত্তর। যাঁদের উত্তর অন্যরূপ তাঁরা আর্টিষ্ট নন। তাঁরা আর্টিষ্টের ছদ্মবেশে শিক্ষক, সংস্কারক, বিপ্লবী, তাঁরা বায়োলজিষ্ট, প্যাথোলজিষ্ট, সাইকোঅ্যানালিষ্ট, তাঁরা দেশানুরাগী, গণপ্রেমিক, যোগীঋষি। আর্ট ফর আর্টস সেক তাঁদের কাছে অনুমোদন পায় না। তাঁরা বলেন Art for the sake of something higher. বিনু বলে, জগতে আর্টের চেয়ে বড় অনেক কিছু আছে, কিন্তু আর্টিষ্টের কাছে আর্টের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। সতীর চোখে যেমন তার নিজের পতিটিই সকলের চেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে আপনার, সর্বতোভাবে একান্ত—যদিও অপরের চোখে পাজী আর নচ্ছার, কাণা আর খোঁড়া, কালো আর কুৎসিত তেমনি আর্টিষ্টের কাছে আর্টই highest, তার চেয়ে higher কিছুই নেই। তাই তার বন্ধু যখন প্রশ্ন করেন, "আর্টাৎ পরতরং নহি?" সে উত্তর দেয়, "নহি"।

সাহিত্যকে হতে হবে সাহিত্য। কী করে তা হয় সে কৌশল যারা জানে তারাই সাহিত্যিক। তারাই আর্টিষ্ট। তারা ত বলবেই, আর্ট ফর আর্টস সেক। কিন্তু তার মানে এমন নয় যে আর্টের জগৎ একটা অন্ধকূপ, তার ভিতরে বাইরের আলো হাওয়া যাওয়া আসা করে না। এমন নয় যে আর্টিষ্ট বাস করে গজদন্তের গম্বুজে; দুনিয়া পুড়ে ছারখার হলেও তার বেহালা বাজানো বন্ধ হয় না। বিনু বলে—আমি ভালোবেসেছি। কখনো নারীকে, কখনো শিশুকে, কখনো বন্ধুকে, কখনো অপরিচিতাকে, কখনো দেশকে, কখনো বিদেশকে। কখনো আইডিয়াকে, কখনো আইডিয়ালকে। আমি ভালোবেসেছি মানুষকে ও মানুষের পরে প্রকৃতিকে। সেই ভালোবাসা আমাকে হাতে ধরে লিখতে শিখিয়েছে, হাতে ধরে লিখিয়েছে। আমি তোমার সৌখীন লেখক নই, না লিখলেও যার চলে। অথবা নই পেশাদার লেখক, না লিখলে যার চলে না। যাদের দেখেছি, চিনেছি, ভালোবেসেছি, তাদের কথা লিখেছি, প্রাণ দিয়ে লিখেছি, লেখায় প্রাণসঞ্চার করেছি। আমি প্রেমিক লেখক। ধর্ম বা নীতি, জাতীয়তা বা সাম্যবাদ; মনোবিকলন বা জৈব ব্যবহার, সাহিত্যে এদের সকলের স্থান আছে, কেন না জগতে এদের স্থান আছে। আমি ত এমন কথা বলিনি যে, ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী। আমার তরীতে ঠাঁই দিয়েছি সবাইকে। কিন্তু তাই, আমার সোনার তরীতে যদি সোনার ধানই না থাকল তবে বাকী সব থেকে হবে কী! ও কি সাহিত্য হবে? যখন বলি আর্ট ফর আর্টস সেক তখন শুধু এই কথাই বলি যে সোনার ধানের জন্যে সোনার তরী। তা বলে অন্য জিনিষকে বাদ দিইনে, ওজন বুঝে জায়গা দিই।

এবার বিনুর দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা। কাদের জন্যে আর্ট? এই ভেবে বিনু একদা কাতর হয়েছে যে, তার এত পরিশ্রম বৃথা যাচ্ছে, তা শুধু জনকয়েক শিক্ষিত জনের পাতে পড়ছে, জনসাধারণের পাতে পৌঁছাচ্ছে না। ভেবেছে, বোধ হয় তার লেখার মধ্যে এমন মাধুরী নেই যার জন্যে জনসাধারণ চাতকের মত তার দিকে তাকিয়ে রইবে। দোষটা তবে কার? এই অপরূপ সমাজব্যবস্থার যা শতকরা সাতজনকে অক্ষর চিনতে শিখিয়েছে, হয়ত একজনকে বই কিম্বা মাসিক কেনবার মত অর্থ দিয়েছে? অথবা বিনুর নিজের? দোষটাকে বিনু নিজের ঘাড়ে টেনে নিয়ে মনে মনে বড় কষ্ট পেয়েছে। যে দেশের সমাজব্যবস্থা এই সেদেশে জন্মিয়ে তার প্রথম কর্তব্য কি নয় দেশকে নতুন সমাজব্যবস্থা দেওয়া? সাহিত্য সৃষ্টির আগে সমাজ ভাঙাগড়া, রাষ্ট্র ভাঙাগড়া? কিন্তু সে যে দেশের সমাজব্যবস্থা এই, সেদেশে জন্মিয়ে লিখবেই বা কবে! যদি লেখে সে কি হবে সাহিত্য, তার মনের মত সাহিত্য? বিনুকে দুঃখের সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করতে

হল যে, স্বরাজ অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু সাহিত্য পারে না। নতুন সমাজ অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু সাহিত্য পারে না। তার মানে বিনুকে সাহিত্য সৃষ্টি করে যেতেই হবে, যদিও তার পাঠক মাত্র জনকয়েক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। তাকে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে এমনভাবে যেন একদিন শিক্ষাবিস্তার হলে সব শ্রেণীর লোক সেই সৃষ্টি উপভোগ করতে পারে। এমন একটা রস সে দিয়ে যাবে যা সমাজবিপ্লবের আগে রাষ্ট্রবিপ্লবের আগে ফুরিয়ে যাবে না। এমন এক অমৃত পরিবেশন করবে যা ইদানীন্তন দেবতারা খেয়ে শেষ করে দেবেন না, যা তথাকথিত দৈত্যদের জন্যে মজুত থাকবে। প্রথম কর্তব্য তাহলে অমৃত মন্থন। অমৃত যখন উঠে আসবে তখন সে বস্তু সকলের জন্যেই আসবে, যদিও আপাততঃ জনকয়েক ভাগ্যবন্ত তার ভোক্তা। বিনু ভাবে, অমৃত কোথায় পাব, কোন্ সাগরে সন্ধান করব তাকে, কোন্ অতলে তলিয়ে যাব? যদি হলাহল ওঠে, তখন? তখন কী করব, কে তাকে কণ্ঠে ধারণ করবে, কে হবে নীলকণ্ঠ? বিনুর বুকটা দমে যায়, তার সাহস কমে যায়। সে জানে যে জমিদারের অত্যাচার, কলওয়ালার স্বেচ্ছাচার, জাগো কিষাণ মজদুর, ইত্যাদি লিখে শ্রেণী-সাহিত্য পরিবেশন করা কঠিন নয়। কিছু গরমমশলার সঙ্গে মার্কস্ বাটা মিশিয়ে ওকে স্বাদু করতে পারা সহজ। কিন্তু সাহিত্য বলে যদি গণ্য করা হয়, তবে শ্রেণীসাহিত্য কেন, নিম্নশ্রেণীর সাহিত্য বলেই তা গণ্য হবে।

না, ওসব সহজ কাজ বিনুর নয়, তার জন্যে অন্য রাঁধুনী আছেন। কিন্তু একটা কথা বিনুও উপলব্ধি করল যে অমৃতের সন্ধান যেখানে করবে সে হিমালয় কি পণ্ডিচেরী নয়, সে জনসাগর। সেই সাগরেই গাহন করতে হবে, নইলে কূলে বসে পাবে বড় জোর শুক্তি, মুক্তা পাবে না। মহামানবের সাগরতীর নয়, সাগরতল। বিনুর কি এত সাহস আছে যে সে ডুব দিতে পারবে? বিনু এই আইডিয়াটা নিয়ে মনে মনে খেলা করে। আজ নয়, কাল। কাল নয়, পরশু। এমনি করে তার দিন কাটে, মাস কাটে, বছর কাটে! দশকও কাটল। তবু তার ডুব দেওয়া হয়ে উঠল না। এইখানেই তার ট্র্যাজেডী। সে ভীরু, ভীরু, ভয়ানক ভীরু। তবে কাপুরুষ তাকে আমি বলব না, সে পৌরুষের পরিচয় দিয়েছে জীবনের অনেক পরীক্ষায়। কাপুরুষ নয়, ভীরু সে। সাগরতীরে বসে দিনের আলো অপচয় করল। এখন আসছে আঁধার। শুধু যে তার নিজের জীবনে আঁধার অর্থাৎ পাকাচুল, তা নয়। দেশের জীবনেও আঁধার, অর্থাৎ অনিশ্চয়তা। ইউরোপের জীবনে ত মহাতমসা, ঘোর বর্বরতা। এই ঘনায়মান সন্ধ্যায় যুগসন্ধ্যায়, যৌবনসন্ধ্যায় বিনুর পাত্রে সুধা কই? কই সেই জীবনসার যা মৃতকেও নবজীবন দেবে, মুমূর্ষুকে দেবে সঞ্জীবনী আশা?

মুক্তা নেই, আছে গুটিকতক নানা রঙের ঝিনুক। সাগরতীরে সারা বেলা বসে বালুর ঘর গড়েছে আর এইসব কুড়িয়েছে বিনু। সেই বালুর ঘরেও ভাঙন ধরেছে। আর সেই সব ঝিনুকও ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। তাহলে বিনু, তুমি করলে কি?

যাক, বিনু হচ্ছে বিনু, সে যা সে তাই। যার যতটুকু দম তার ততটুকু দৌড়। বিনু যে টলষ্টয় নয় এর জন্যে আফশোষ করে কী হবে! স্বয়ং টলষ্টয় কি ব্যর্থ হননি? সাগরতলে ডুব দিয়ে তিনি কি তুলতে পারলেন অমৃত? জনগণের সঙ্গে বাস করলেন কিন্তু এক হতে পারলেন কি? জনগণের মন চিনলেন। কিন্তু মন পেলেন কি? তাদের জন্যে কত লিখলেন। তারা পড়ল কি ওসব? এত বড় ট্র্যাজেডী পৃথিবীতে বেশী হয়নি। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিকে তিনি ঘৃণা করে সরিয়ে রাখলেন, কেননা ওতে রয়েছে অভিজাতদের অশুচি জীবন-কথা। শেষ জীবনে প্রায়শ্চিত্ত করে ওসব ত তিনি বিসর্জন দিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের দেশেই এমন দিন এল, যেদিন অভিজাত বলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল তাঁর প্রিয়তম জনসমাজ, বিপ্লবী জনসমাজ। গর্কী তাদের আপনার লোক, তাই তাদের সভাকবি। অথচ টলষ্টয়ের তুলনায় গর্কী কত ছোট—কত ছোট তাঁর পরবর্তী কান্তে হাতুড়ী মার্কা গণসাহিত্যিক। তবে আশার কথা এই যে, দিন ফিরছে। টলষ্টয়ের বই আজকাল খুব চলছে রাশিয়ায় এবং সে সব বই যে কেবল তাঁর শেষ জীবনের প্রায়শ্চিত্তের পরে লেখা বই তা নয়, প্রথম বয়সের সেই সব পঙ্কিল জটিল চঞ্চল অলস চিন্তাকুল ভাবালু বীর্য্যবান সম্ভ্রান্ত সমাজের চিত্র। কারণ কি? কারণ, সেগুলিও আর্ট। আর্টের আকর্ষণ দুর্বার।

বিনু নিজেকে টলষ্টয়ের সঙ্গে তুলনা করতে চায় না। টলষ্টয়ের ছিল সাহস, বিনয়, বিনুর তা নেই। বরং তুলনা করা চলে চেকভের সঙ্গে তার। চেকভ যে সময়ের কথা লিখতেন, যেমন কারুণ্যের সঙ্গে লিখতেন, বিনুর অনেকবার মনে হয়েছে, বিনুও সেই সময়ের কথা, সেই সমাজের কথা, তেমনি কারুণ্যের সঙ্গে লিখছে। আসবে ঝড়, উড়বে ধুলো, কোথায় থাকবে আমাদের এই মধ্যবিত্ত সভ্যতা, এই "Cherry Orchard"? এই যে আমরা আজ সম্মেলন করছি, এমনি কত সম্মেলন হয়ে গেছে চেকভের দেশে, ঝড়ের আগে। সে সমাজও নেই, সে সম্মেলনও নেই, সে সভ্যতা ও সংস্কৃতি শেষ হয়ে গেছে।

তা বলে অসার্থক হয়নি। ঝড়ও চিরদিন থাকে না, ধুলো মরে যায়। নতুন করে বুর্জোয়া গজায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণী মাটি ফুঁড়ে বেরোয়। রুশ দেশেও তাই হচ্ছে। চেকভ পড়ে উপভোগ করবার মত শিক্ষিত সংস্কৃতিবান সংবেদনশীল মন আবার সে দেশে বিবর্তিত হবে। তেমনি এদেশেও। কাজেই সত্যিকার সৃষ্টির ব্যর্থতা নেই। ভবভূতির উক্তি উদ্ধার করে শেষ করি—

"যে-নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥" *

*প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের জামসেদপুর অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ

বানপ্রস্থ

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

গ্রীষ্মকাল। ভালো করিয়া সন্ধ্যা হয় নাই, পশ্চিম আকাশে তখনও আলো ছিল।

প্রত্যহ দেশপ্রিয় পার্কের চারিপাশে গণিয়া গণিয়া মোট দশটী পাক দিয়া ভ্রমণ শেষ করা রায় বাহাদুরের অভ্যাস; কিন্তু আজ আড়াই চক্র শেষ করিয়াই ভ্রমণ স্থগিত হইল। পার্কের পূর্বদিকে একটা বেঞ্চিতে এক বৃদ্ধ একাই বসিয়া ছিলেন,—মাথায় টুপি, গায়ে গলাবন্ধ কোট, কোটের উপর ভাঁজকরা চাদর, চোখে চশমা ও হাতে লাঠি। ভদ্রলোক পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাইয়া মগ্ন হইয়াই ছিলেন, বোধহয় দেখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন যে, সন্ধ্যার ওধারে তো অন্ধকার, কিন্তু অন্ধকারের ওধারে কি!

বৃদ্ধকে দেখিয়া রায় বাহাদুর থামিলেন, পথ ছাড়িয়া বেঞ্চির দিকে আগাইয়া গেলেন, এবং সম্মুখে গিয়া ডাকিলেন—"কে, নরেন না?"

বৃদ্ধ চোখ চার্হিয়া দেখিলেন, পরে কহিলেন—"ও, সতীশ? বোস।"

রায় বাহাদুর সতীশ চক্রবর্ত্তী রায় সাহেব নরেন বসুর পার্শ্বে বেঞ্চিতে আসন গ্রহণ করিলেন। রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এখানে কোত্থেকে?"

—"আমি এখানেই থাকি, পণ্ডিতিয়া রোডে। কবে পেনসন্ নিলে?"

—"ছ'মাস হয়নি। পণ্ডিতিয়া রোডে থাক, অথচ একদিনও দেখা হয়নি।"

—"আমি এধারে বেড়াতে আসিনে, লেকে যাই।"

—"লেকে যাও? আমি এ পার্কেই বেড়াই, রোজই। পণ্ডিতিয়া রোডে বাড়ী করেছ?"

—"আমি করিনি, ছেলে করেছে। তোমার খবর বল।"

—"আমার খবর? রাসবিহারী এভিনিউতে বাড়ী করেছি—লাভ হোল না।"

রায় সাহেব প্রশ্ন করিলেন—"কেন?"

রায় বাহাদুর উত্তর দিলেন—"কেন? যাঁর জন্য বাড়ী তিনি নেই।"

—"তোমার স্ত্রী মারা গেছেন? কদ্দিন হোল?"

রায় বাহাদুর প্রশ্ন করিলেন—"জিজ্ঞেস করলে কিছু?"

—"হাঁ, তোমার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করছি, কবে গেলেন?"

—"পেনসন নেবার কয়েকদিন আগে।"

সম্মুখের রাস্তায় কয়েকটী মেয়ে গল্প করিতে করিতে আসিতেছিল, তাহারা সম্মুখে আসিয়া পড়িল। রায় বাহাদুর সতীশবাবু তাহাদিগকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইলেন। পরে রায় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেখেছ ?"

—"দেখেছি। ওভাবে তাকিওনা, অসভ্য ভাববে।"

—"অসভ্য ভাববে ? কি রকম পোষাক করেছে লক্ষ্য করেছ ?"

—"করেছি।"

—"আজকালকার মেয়েদের তোমার ভালো লাগে ?"

রায় সাহেব জানাইলেন—"লাগে। তোমার মেয়ে জামাই কেমন আছে ?"

—"মেয়ে জামাই ? জামাই নেই, মারা গেছে।"

এতক্ষণ পরে রায় সাহেব নরেন বসু, রায় বাহাদুর সতীশ চক্রবর্ত্তীর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখা দরকার বোধ করিলেন। তারপর পূর্ব্বের মতই সম্মুখের আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া লইলেন, কহিলেন—"মেয়ে কোথায় ?"

—"এখানেই থাকে।"

—"আর কে আছে ?"

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেয়ের ? না, তার কোন ছেলে মেয়ে হয়নি।"

—"না, এখানে তোমরা কে কে আছ জিজ্ঞেস করছি।"

—"কে কে আছি ? মেয়ে আমি ঝি চাকর, আর কেউ নেই।"

রায় সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে প্রশ্ন করিলেন—"মেয়ের আবার বিয়ে দেওনা কেন ? বয়স এখন কত হবে ?"

—"বয়স ? এই কুড়িতে পড়েছে।"

—"বিয়ে দিয়ে দাও।"

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কার, মেয়ের ? দরকার হবেনা, বাড়ীটা পাবে, আর যা টাকা রেখে যাব তা খরচ করে শেষ করতে পারবে না।" বলিয়া পকেট হইতে একটি রূপার কৌটা বাহির করিলেন, কালো রংয়ের একটী বড়ি খুলিয়া লইয়া মুখে পুরিলেন এবং কৌটাটা পুনরায় পকেটে রাখিয়া দিলেন।

—"কি খেলে ? ওষুধ ?"

"হাঁ, খাবে ? আমি এখনও রোজ দুটো করে ডিম খাই, অসুখ করে না। খুব খাবে, বুঝলে ! এ বয়সে খাওয়া দরকার।—একটা খেয়ে দেখবে ?"

রায় সাহেব নরেন বসু বলিলেন—"না। আমি ডিম খাইনে, ওসব ওষুধ আমার দরকার হয় না।"

—"আচ্ছা নরেন, তুমি সেই সব এখনও করছ, না ছেড়ে দিয়েছ ?"

—"কি সব ?"

—"তুমি তো যোগ অভ্যাস করতে।"

—"এখনও করি। কেন ?"

—"কোন লাভ হয় ওতে ?"

—"কি লাভ তুমি চাও ?"

—"তুমি যার জন্য ওসব করছ, তা পেয়েছ ?"

রায় সাহেব নরেনবাবু বলিলেন—"পেয়েছি।"

—"কি পেয়েছ ?"

—"শান্তি।"

রায় বাহাদুর প্রশ্ন করিলেন—"শান্তি ? শান্তি পাওয়া যায় ?"

—"যায়।"

রায় বাহাদুর সতীশ চক্রবর্ত্তী রায় সাহেব নরেন বসুর উত্তর শুনিয়া চুপ করিলেন। খানিকক্ষণ পরে কহিলেন—"আচ্ছা, তোমার খোঁজে কোন যোগীপুরুষ আছেন ?"

—"আছেন। কেন ?"

—"দেখ, আমি পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত দিতে রাজী আছি, আমাকে নিয়ে যাবে ?"

রায় সাহেব নরেন বসু আকাশ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আনিয়া রায় বাহাদুর সতীশবাবুর মুখের উপর রক্ষা করিলেন।

তারপর জানিতে চাহিলেন—"যোগীপুরুষ দিয়ে তুমি কি করবে ?"

—"কিছু করব না। শুধু আমার স্ত্রীকে এই বাড়ীতে একবার দেখতে চাই, তিনি যেমনটী ছিলেন তেমনটী। যদি দেখাতে পারেন, আমি পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত দিতে পারি। কেউ দেখাতে পারেন ?"

—"পারেন। কিন্তু সে ম্যাজিক দেখে তোমার লাভ ?"

রায় বাহাদুর বলিলেন—"লাভ ? না, লাভ কিছু নেই, এ শুধু আমার খেয়াল। আমি তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করতে চাই যে, সুখে আছেন কিনা।"

—"ধর তিনি সুখেই আছেন, তাতে তুমি তৃপ্ত হবে ?"

—"তুমি বলছ তিনি সুখেই আছেন। আমি তাঁর নিজের মুখে শুনতে চাই। এমন লোক তোমার জানাশোনা আছে ?"

রায় সাহেব নরেনবাবুর দৃষ্টি আকাশেই আবার নিবদ্ধ হইয়াছিল। সেদিকে চাহিয়া তিনি চুপ করিয়া খানিকক্ষণ রহিলেন, পরে বলিলেন—"তুমি এক কাজ কর।"

—"কি কাজ ?"

—"তুমি রাখ না কেন ?"

—"কি রাখব ?"

রায় সাহেব বুঝিলেন যে, রায় বাহাদুর কথাটা বুঝিতে পারেন নাই, কহিলেন—"সকলে যা রাখে, মেয়ে মানুষ।"

—"মেয়ে মানুষ রাখতে বলছ, তুমি রাখতে পার ?"

—"আমার স্ত্রী বেঁচে আছেন।"

—"তিনি মারা গেলে রাখতে পারতে ?"

—"দরকার হোলেই পারতাম।"

রায় বাহাদুর প্রশ্ন করিলেন—"স্ত্রীর জন্য কষ্ট হোত না ?"

—"হোত, তা কয়েকটা দিনের জন্য।"

—"কয়েকটা দিনের জন্য ? মরেনি, তাই বলতে পারছ। নরেন, মানুষ মরে কেন বলতে পার ?"

রায় সাহেব উত্তর দিলেন—"পারি। আয়ু ফুরিয়ে গেলেই মরে।"

—"চিরকাল আয়ু থাকেনা কেন ?"

—"সে নিয়ম নেই। সকলকেই মরতে হয়।"

রায় বাহাদুর বলিলেন—"সকলকেই মরতে হয়, আমিও মরব ?"

রায় সাহেব নিঃসঙ্কোচে জবাব দিলেন—"মরবে বইকি, দুটোর জায়গায় দশটা ডিম খেলেও মৃত্যু এড়াতে পারবে না।"

—"হুঁ, মৃত্যু এড়াতে পারব না। আচ্ছা, মরার পর ওঁর সঙ্গে দেখা হবে তো ?"

—"হতেও পারে, নাও হতে পারে।"

—"নাও হতে পারে বলছ। তবে মরে লাভ, তখনও তো দেখা হবে না ?"

রায় সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—"তোমাকে যা বল্লাম, তাই কর।"

—"কি বল্লে ?"

—"মেয়ে মানুষ রাখতে।"

—"মেয়ে মানুষ ? কোথায় পাব ?"

রায় সাহেব বলিলেন—"প্রচুর পাবে। তাছাড়া, তোমার টাকা রয়েছে।"

—"টাকা ? তা আছে। টাকায় মেয়ে মানুষ পাওয়া যায় ?"

—"সব পাওয়া যায়। এই পার্কেই একটু রাত করে এস, ভদ্রঘরের মেয়ে পাবে।"

রায় বাহাদুর অবাক হইলেন—"ভদ্রঘরের ? তারা ঘর বাড়ী ছেড়ে আসবে কেন ?"

—"আসবে। বলছি চেষ্টা করে দেখ।"

সন্ধ্যা শেষ হইয়া রাত্রি সুরু হইয়াছে, খেলা বন্ধ করিয়া ছেলেরা হল্লা করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। বৃদ্ধদের সামনেই রাস্তার উপর একটা অবাধ্য ছেলে কিছুতেই এখন বাড়ী ফিরিবে না বলিয়া চাকরটার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, হাত ছাড়াইতে না পারিয়া অবশেষে শরীর ছাড়িয়া দিয়া রাস্তার উপরই শুইয়া পড়িতে চেষ্টা করিতেছিল। চাকরটা অতি কষ্টে তার চীৎকার, হাত পা ছোঁড়া ইত্যাদি অগ্রাহ্য করিয়া তাকে জাপ্‌টাইয়া কোলে তুলিয়া লইতে সক্ষম হইল।

রায় সাহেব বলিলেন—"আমি উঠ্‌ছি।"

—"উঠ্‌ছ ? যোগীর খোঁজ দিলে না।"

—"আচ্ছা, দেব। দেখ, মেয়েটার বিয়ে দিও, ভাল স্বাস্থ্য দেখে একটী বুদ্ধিমান ছেলের হাতে দিয়ে যেও। বুঝলে !" রায় সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রায় বাহাদুর কহিলেন—"যাচ্ছ ? আর একটু বসতে পারবে না ?"

রায় সাহেব বলিলেন—"না, ভাই। একজনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তিনি এসে গেছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আসি, কেমন—"

রায় সাহেব চলিয়া গেলেন। লাঠি হাতে বৃদ্ধ রায় বাহাদুর সতীশ চক্রবর্তীও বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আজ আর ভ্রমণটুকু শেষ করা হইল না। তিনি বাড়ীর দিকেই রওয়ানা দিলেন।

বাড়ীতে বসিবার ঘরে ঢুকিতেই মেয়ে বলিল—"বাবা, দেখ কে এসেছে।"

সুদর্শন ও দীর্ঘকায় একটী ছেলে উঠিয়া আসিয়া নত হইয়া পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল।

—"কে, সন্তোষ ? ভালো আছ ?"

—"আজ্ঞে।"

—"বাবা মা ?"

—"তাঁরা ভালো আছেন। আপনি ?"

—"আমি ? ভালো আছি। কবে এলে ?"

—"আজ ভোরে।"

—"দিল্লী থেকেই তো আসছ ?"

—"আজ্ঞে।"

—"কোথায় উঠেছ ?"

ছেলেটী একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—"একটা হোটেলে।"

—"হোটেলে? না, ওখানে থাকা চলবে না। যদ্দিন কলকাতায় আছ এখানেই থাকবে। খুকী, গাড়ীটা পাঠিয়ে হোটেল থেকে ওর জিনিষপত্র আনিয়ে নিস।"

ছেলেটী আপত্তি করিতে যাইতেছিল। রায় বাহাদুর খেয়াল করিলেন না, বলিলেন—"বসন্ত দিল্লীতেই আছে?"

—"না, বাবা মা রামেশ্বর বেড়াতে গেছেন।"

—"রামেশ্বর গেছে? এখনও তো বিয়ে করনি?"

ছেলেটী হাসিয়া ফেলিল—"না, বিয়ে করলে বাবা আপনাকেই আগে খবর দিতেন।"

—"তা দিত। বসন্ত ও আমি ছেলেবেলা একস্কুলে পড়া আরম্ভ করি, এক আপিসে একসঙ্গে ত্রিশ বছর চাকুরী করি। আচ্ছা তোমরা কথা বল। হোটেল থেকে জিনিষপত্র নিয়ে আসে যেন—" শেষের কথাটী কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। "আচ্ছা—" বলিয়া সন্তোষের পানে আর একবার তাকাইয়া রায় বাহাদুর ভিতরে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

ঘড়িতে রাত একটা বাজিয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুরের কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। শিয়রের দিকে দক্ষিণের জানালাটা খোলা, হু-হু করিয়া রাত্রির বাতাস ঘরে আসিতেছিল, তবু রায় বাহাদুর ঘুমাইতে পারিতেছিলেন না। মাথাটা যেন কেমন তপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইচ্ছা নাই, ভাবিতেও চাহিতেছিলেন না, তবু চিন্তাগুলি জোর করিয়া মাথা দখল করিয়া বসিয়াছিল। কুণ্ডলী পাকাইয়া এগুলি মাথার মধ্যে খুসীমত নড়াচড়া করিতেছে।…নরেন যোগ অভ্যাস করে, বলে শান্তি পাইয়াছে। শান্তি…শান্তি কি পাওয়া যায়? …একজন যদি যোগী-পুরুষ তেমন পাওয়া যায়, হাঁ, তিনি পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত দিতে পারেন।… খুকীর বিবাহ দিতে বলিল, ভালো ছেলের সঙ্গে। খুকীকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।…মেয়েমানুষ রাখিতে পরামর্শ দিল, পার্কে এখন গেলে কি ভদ্রঘরের মেয়ে পাওয়া যায়?…নরেন অন্য সব দিক দিয়া ভালো, কিন্তু মাথাটা যেন তার কেমন হইয়া গিয়াছে, অসম্ভব কথা, ভয়ানক কথা অনায়াসে বলিয়া যায়।… মানুষ মরে কেন? আয়ু ফুরাইয়া যায়। চিরকাল আয়ু থাকে না কেন? নিয়ম নাই। হুঁ, আমিও মরিব, দুটার জায়গায় দশটা ডিম খাইলেও মরিব।…মরার পর দেখা নাও হইতে পারে, তবে মরিয়া লাভ?…

রায়বাহাদুর খাট হইতে নামিলেন, বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। ওপাশে

খুকীর ঘরে এত রাত্রে গল্প শোনা যায়, খুকীও জাগিয়া আছে, কার সঙ্গে কথা বলিতেছে?

রায় বাহাদুর বারান্দা ধরিয়া সন্তর্পণে আগাইয়া চলিলেন। দরজার কাছে আসিয়া থামিলেন, কান পাতিয়া শুনিলেন। —যাক্, একা একা কথা বলিতেছেনা, ঘরে সন্তোষ আছে। সারা বাড়ীটা অন্ধকার।

রায় বাহাদুর নিজের ঘরে আসিতে গিয়া থামিলেন, কি ভাবিলেন, তারপর ফিরিয়া বারান্দা ধরিয়া আগাইয়া চলিলেন। খুকীর ঘরও পার হইয়া গেলেন। অবশেষে একটা ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দরজা খোলাই ছিল, ঠেলা দিতেই খুলিয়া গেল। রায় বাহাদুর নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঘর অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, শুধু ওদিকের খোলা জানালাটা দেখা যাইতেছিল। তিনি হাত বাড়াইয়া সুইচ টিপিয়া দিলেন। কড়া আলোতে ঘর ভরিয়া গেল, রায় বাহাদুর চক্ষু বুজিয়া ফেলিলেন।

মেঝেতে মাদুর পাতিয়া বাড়ীর পদ্ম-ঝি শুইয়া আছে, রায় বাহাদুর গিয়া মাদুরের একধারে বসিয়া পড়িলেন।—মেয়েটার বয়স কত, বেশী নয়, বছর সাতাশ আটাশ হইবে। রায় বাহাদুর চাহিয়া রহিলেন। এক সময়ে অতি আস্তে তার গায়ের উপর একখানা হাত রাখিলেন।

ঝি চোখ মেলিল। সেকেণ্ড কয়েক পলকহীন অর্থশূন্য দৃষ্টি মেলিয়া রাখিল। পরে গায়ের কাপড় ঠিক করিয়া উঠিয়া বসিল।

—"না না, উঠ না, তুমি শুয়ে থাক।"

মেয়েটী কোন কথাই কহিতে পারিতেছিল না, মাথার কাপড়টা আর একটু ঠিক করিয়া লইয়া চুপ করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া রহিল।

—"আমি তোমার পাশে একটু ঘুমোব? একা আমার ঘুম আসছে না, আমি এখানে একটু শুই, কেমন?" বলিয়া বৃদ্ধ মাদুরের উপরই কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িতেছিলেন।

মেয়েটী বাধা দিল—"না, এখানে ঘুমোবেন না, আপনার অসুখ করবে।"

রায় বাহাদুর থামিলেন,—"অসুখ করবে?"

—"হাঁ। আপনার ঘরে চলুন, আমি আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে আসছি।"

—"আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে? চল।" বলিয়া রায় বাহাদুর পদ্মর কাঁধে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঘর হইতে বাহির হইবার সময় রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় যাচ্ছ?"

—"না, আলোটা নিভিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া ঝি হাত বাড়াইয়া সুইচ্‌টা

নিভাইয়া দিল। বারান্দায় অন্ধকারে দুজনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

—"না না, ওদিক দিয়ে নয়, চল ঘুরে যাই। খুকী আর সন্তোষ ওঘরে জেগে আছে।"

কয়েক পা গিয়া রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"পদ্ম, তোমার কি মনে হয় ওরা দু'জন একত্র শুয়ে আছে?"

অতি আস্তে পদ্ম বলিল—"বসেও গল্প করতে পারেন।"

—"না না, তুমি বুঝতে পারছ না, ওরা—"

রায় বাহাদুর পদ্মকে আরও কাছে আকর্ষণ করিয়া লইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আমাকে ভালোবাসবে?"

পদ্ম কোন উত্তর দিল না, অন্ধকারে তার মুখের ভাবও কিছু বুঝা গেল না। হাতটা পদ্মের মুখে বুলাইয়া বুকের উপর আনিয়া রাখিয়া রায় বাহাদুর বলিলেন—"তুমি পালাবে না ত?"

পদ্ম নিম্নস্বরে জানাইল—"না, পালাব কেন।"

—"হাঁ, যেওনা। আমি যদ্দিন আছি, তুমি মর না।"

অন্ধকারে দু'জনে দু'টী ছায়ামূর্ত্তির মত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বারান্দা দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। নীচের বাগান হইতে ফুলের গন্ধ বাতাসে বারান্দা অবধি উঠিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বারান্দাটা ঘুরিয়া মোড় ফিরিতেই সম্মুখে খোলা আকাশ চোখের উপর আসিয়া পড়িল।

রায় বাহাদুর রাত্রির আকাশের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। যতদূর দৃষ্টি যায় আকাশ ভরিয়া অন্ধকার। এ কী অন্ধকার! এর শেষ কোথায়! এর কি পার আছে? অন্ধকার, কেবল অন্ধকার—এর শেষ নাই, উঃ···

রায় বাহাদুরের মাথাটা কাৎ হইয়া এলাইয়া পড়িল। 'জলে-ডোবা মানুষের মত বৃদ্ধ দুই হাতে মেয়েটীকে জড়াইয়া ধরিলেন, মাথাটা তাঁর বুকের মধ্যে গুঁজিয়া লইয়া ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। বলিলেন—"উঃ, কি অন্ধকার।—" ঝি ভয় পাইয়া গিয়াছিল, কহিল—"দিদিমণিকে ডাকব? অমন করছেন কেন?"

বৃদ্ধ উত্তর দিতে পারিলেন না, বুকের মধ্যে এলাইয়া-পড়া মাথাটা শুধু কয়েকবার নাড়িলেন। পদ্ম-ঝি অন্ধকার বারান্দায় রায় বাহাদুরকে শিশুর মত বুকে জড়াইয়া লইয়া কাঁপিতে লাগিল।

সম্মুখের আকাশে অন্ধকার, সীমাহীন অন্ধকার—সে অন্ধকারে তারাগুলি পদ্ম-ঝির মতই কাঁপিতেছে—ভয় কখন নিভিয়া অন্ধকারে হারাইয়া যায়।

আগাগোড়া

জীবনানন্দ দাশ

ক্রমেই আমের কুঞ্জ অধিক মুকুলে আরো ভারী হয়ে ওঠে।
আঙ্গিরের শাখাগুলো আকাশের দিকে চ'লে গেছে—
বিচিত্র, বিভিন্ন, ঋজু অগ্নির মতন।
বাতাসের সিঁড়ি বেয়ে ভোরের চাতকপাখি আকাশের পথে
কোনো এক দ্বার চায়।
সুদূরে সূর্য্যের বিম্বে পবিত্র নারীর দেহ যেন
প্রকাশিত হয়ে ওঠে,—ধীরে ধীরে সকলের তরে।
পাখির হৃদয় তবু আমৃত্যু সেনের মত উঠে
ঊর্দ্ধ—আরো ঊর্দ্ধতর আকাশের অভিক্ষেপে এসে
প্রতিটি খাঁজকে শুধু মুহূর্ত্তের ক্যাম্প ব'লে ভাবে।
নিচে শঙ্খসাপিনীর মত লোল বাতাসের বিভা
নির্জ্জন বিস্ময়ে চেয়ে আছে:
এই পাখি সম্মোহিত বেতালের মত
উলঙ্গ কঙ্কাল মেলে চ'লে যায় গগনের কাছে?
সেখানে কে আছে!

সে কি শুধু কামানের গুলির মতন?
অথবা বেসুনবাজ মাতালের ঊর্দ্ধে আরোহণ—
দু' চারটে মদের বোতল, অগ্নি, বিড়াল ও কাকাতুয়া নিয়ে?
অথবা সে নিয়ন্ত্রিত মেধাবীর মত দূর ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে
প্রশান্ত হৃদয় মেলে চুপে চুপে যেতেছে হারিয়ে।

পৃথিবীতে বেঁচে থেকে ঢের দিন আমি
দেখে গেছি বহুতর জিনিষের ঊর্দ্ধে গমন।
সোনার আসনে চ'ড়ে সে এক দালাইলামা গিয়েছিল একদিন;
লোহার প্রবাদে আজ অনেক ট্রট্স্কি, বুখারিন;

মধ্যযুগে সিল্‌ফ্‌, পরী, জিন
সালামাণ্ডার, স্তম্ভ, লোষ্ট্র, চিল, পণ্ডিতের মন
সর্ব্বদাই পৃথিবীর এক দ্বারে প্রকাশিত হয়ে
আকাশের অন্য দুয়ার দিয়ে অলোকসামান্য নিঃসরণ
জেনে গেছে।
তারপর টানাপোড়েনের ছাঁকা সুতো হয়ে অবলীলাভরে
মিশে গেছে মানুষের সাধারণ কাপড়-চোপড়ে।

ছুটে গেছে বালকের হাত থেকে ঢিল।
সমাধি বিদীর্ণ ক'রে উড়েছে দলিল।
জ্যামিতির রেখা গেছে শূন্যের ভিতরে—ইসারায়।
গোধিকার উঁচু মুখ উপরের আগুনকে খায়।
টেবিলে তামার মূর্ত্তি স্বর্গ রসাতল আসে ঘুরে;
অত্যধিক ধূর্ত্ততায় চেয়ে থাকে মনীষীর চোখোচোখি নিটোল দুপুরে;
আছে বটে। তবুও অনেক আগে চ'লে গেছে উড়ে।

ডাইনামো ব্যাঙের মত ব্যাপ্ত শব্দ করে।
পুষ্ট এরোপ্লেনের মনীষা—
ক্রমেই নিজেকে আরো উজ্জ্বল করে না কি, হে হোরবেলিশা।

পাইস রেস্তরাঁতে আমি চায়ের পেয়ালা নিয়ে ব'সে
সর্ব্বদাই দেখে গেছি অগণন চাখড়ির মত শুষ্ক মুখ;
ভিড়ে ভিড়ে ধূলপরিমাণ সব প্রত্যর্পিত হলুদ চিবুক।
—কোমরে দুহাত রেখে এই সব উড়ুনিকে তারা
উড়ায়ে দিয়েছে হেসে হেসে।
কারণ তাদের মত কে আর দেখেছে সব—বস্তু নির্ব্বিশেষে।
তাহাদের সকলেই সায় দিয়ে—মাথা নেড়ে—ম'রে গেলে—তবু তারপর—
তাহাদের মাঝ থেকে একজন ব'লে গেল এই:
অনেক দালাল ঘেঁটে পৃথিবীতে অবশেষে—সময়ের শেষ গোল মোরে
মৃত পিতৃপুরুষের পরিত্যক্ত প্রতিশ্রুতি অধিকার ক'রে
ঠেকেছি নক্ষত্রে গিয়ে—

মৃগশিরা, জলসর্প, স্বাতী, সরমায়।
সর্ব্বদা প্রদীপ্ত ভোর সেইখানে—
আমাদের পৃথিবীর প্রভাতকে প্রস্তুত ডাঁশির মত পেয়ে
এক গাল ম্লান জল দিয়ে গিলে খায়।
তবু সব মৃত বধিরের ভিড়
মৃত বাচালের ভিড়
মৃত ব্যাপারীর ভিড়
ছদিকের কানে পুষ্ট অগণন চাঁদিনীর মত গোল শির
সেই লাল আগুনের রঙে এসে নিজেদের শরীরের ম্লান প্যারাফিন
ক্রমে ক্রমে ক'রে তোলে শ্বেত—দীপ্ত—অত্যন্ত রঙীন;
হরিণের কণ্ঠে যেই গান আসে বাঘিনীর মুখে ধরা প'ড়ে
সে রকম বড় আগুনের গান গায়।

'প্যারাডাইস লষ্ট'

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সন্ধ্যার ছায়া ঘনায়ে এসেছে মাঠের 'পরে
মেঠো রাস্তায় চলনা দু'জনে বেরিয়ে পড়ি',
গাড়ীখানা থাক্ এইখানে, চল—কিসের ভয়?
সহুরে মেয়ের যত ভিরকুটি ড্রয়িংরুমে।

তখন বললে,—ট্র্যাণ্ডে নয়ক, ড্রাইভে চল
দূরে বহুদূরে যেতে যেতে বেশ সন্ধ্যা হবে,
চুপচাপ বসে রব দুটি মোরা একলা প্রাণী—
খুব কাছাকাছি নিরালায় হবে মনের কথা।

ম্যাটিনির শো ন'টায় ভাঙবে মিথ্যে ছুতো
দেরী হ'লে আছে সাইকলজির এক্সট্রা ক্লাশ;
জীবন-ধর্ম্ম থাক ধামাচাপা, যৌবনেরে
অভিষেক করে আজিকে বসাব সিংহাসনে।

সারাটি রাস্তা চুপ করে এলে কওনি কথা,
মাতালের মত একই কথা আমি এলাম বলে,'
কোন্ মদে আমি না-খেয়ে মাতাল সেকথা জান,
নির্ব্বোধ নহি, ক্ষমা করো মোর অবাধ্যতা।

লেখাপড়া শিখে এ্যাড্‌ভেঞ্চারে সরেনা মন,
বয়স থাকিতে সঞ্চয় কর অভিজ্ঞতা,
তেষ্টায় যদি ফুটিফাটা হ'ল বুকের ছাতি
ঝরণা ফেলিয়া কেবা ছুটে যায় বালুবেলায়?

অমাবস্যার আঁধারে আমরা লুকিয়ে আছি—
সারা সহরের দৃষ্টি এড়িয়ে এলাম হেথা,
কাছে আসিবার এমন সুযোগ করোনা হেলা
নরম ঘাসের গালিচা বিছান,—কষ্ট হবে?

এইখানে বসো,—এমন নিরালা সন্ধ্যাবেলা
ক্লান্ত দেহের ভার সহেনাক' এমন ক্ষণে,
কাছে সরে এস, হাত ছুটি দাও আমার হাতে,
শোন বলি, সেই চির-পুরাতন নোতুন কথা।

অ্যাডাম ইভের কাহিনী পড়েছ,—'মরাল' জান?
প্যারাডাইসের নিষিদ্ধ ফল মিষ্টি বেশী
জল এগোয় না, তেষ্টা এগোয়,—সত্যি কথা
অজানা স্বর্গ হারিয়ে পেলাম স্বর্গ হাতে।

তুলে নাও বল্লম তোমার

রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অবাস্তব স্বপ্ন যত চিত্তেরে ঘেরিয়া রাখে—
বিদ্ধ কর তাহাদের বল্লমে তোমার!
সূর্যরশ্মি ঝলোমল, তীক্ষ্ণশাণ উজ্জ্বল বল্লম
মৃত্যুর প্রতীক……
লৌহের সুতীক্ষ্ণ জিহ্বা স্বাদ পাক উত্তপ্ত রক্তের
—শুষ্ক কণ্ঠ পূর্ণ ক'রে নিক!

তুলে নাও তোমার বল্লম,
টেনে আনো চোখের আগেতে—
ডাহিনে চাপিয়া ধর লৌহকণ্ঠ মারণ অস্ত্রের,
বাম কর-অংগুলি পরশে,
দেখে নাও কত তীক্ষ্ণ আছে কত শাণ।

তোমার মুখের ছবি ছায়া হ'লো বল্লমের চিকণ বুকেতে,
মুখের সুদৃঢ় রেখা প্রাণ দিল বল্লমের দেহে।
তোমার চোখের দীপ্তি ভাস্কর বহ্নির চেয়ে অনেক উজ্জ্বল,
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিল—জড়লৌহ নির্মিত বল্লমে!

কুৎসিত তোমার ছবি চেয়ে দেখে লৌহ অস্ত্রখানি।
বিতৃষ্ণায় অক্ষিতারা তির্যক কপিশ—
ললাটে চিন্তার রেখা……
দু'খানি চোখের কোলে আঁকা আছে অনিদ্রার ছাপ,
বাতাসে উড়িয়া পড়ে রুক্ষকেশ প্রশস্ত ললাটে…
তুমি অসুন্দর……।

সুন্দর নহেক তব দীপ্ত অস্ত্রখানি—
ও যে কালো মৃত্যুর প্রতীক…

ওর তীক্ষ্ণ সূচী মুখে মাখা আছে সর্বধ্বংসী বিষ,
ওর-ই তীব্র দীপ্তি বিচ্ছুরণে
ত্রাসে কাঁপি' উঠিছে চৌদিক!

শীর্ণঅস্থি বাহুখানি
দৃঢ় মুঠি নির্মম কঠিন,
শিরাগুলি মুষ্টি চাপে হ'য়েছে প্রকট।
ধমনীতে রক্তস্রোত হয়েছে উত্তাল···

উদ্যত করেছ অস্ত্র?
কুৎসিত তোমার দেহ—এ যে দেখি অপূর্ব সুন্দর!

বাম আঁখি ক্ষুদ্র হ'লো খুঁজিতে নিশানা···
দক্ষিণ চোখেতে জ্বলে সংহার-আগুন···

শ্বাস টানি' ধরিয়াছ?
বিশ্ব তাই বায়ুশূন্য বুঝি?

সহসা মুছিয়া গেল চিন্তাক্লিষ্ট তোমার ললাটে
রুক্ষ রেখাগুলি।

নিরুপমার চোখ

প্রতিভা বসু

নিরুপমাকে আমি পড়াই। পড়াই আমি দু'বছর যাবত, তখন নিরুপমা ছিল চৌদ্দ বছরের মেয়ে এখন তার ষোলো। ওর ঠাকুর্দা বলেন এই সবে বারো পেরিয়ে তেরোয় পা দিল।

অতিশয় সনাতনী ভাব ওর বাপ-ঠাকুর্দার। যতক্ষণ পড়াই সমস্তক্ষণ ওদের পুরোনো আমলের চাকর হরিসাধন শাসক এবং প্রহরীরূপে সেখানে মোতায়েন থাকে, মাঝে মাঝে ওর কর্মহীন ঠাকুর্দাও তাঁর জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে শয্যা ছেড়ে উঠে আসেন নাত্‌নীকে দেখ্‌তে। আর নিরুপমা নতমুখ আরো নত করে, সংকুচিত দেহ আরো কুঞ্চিত হয়। শীত-গ্রীষ্ম তাকে ফুলহাতা জামা পরতে দেখি, তা ছাড়া সমস্ত শরীরকে সে শাড়ী দিয়ে এমনভাবে আবৃত ক'রে রাখে যে একমাত্র হাতের আঙুল ক'টি ছাড়া আর কিছুই দেখবার উপায় নেই। মুখখানা এতই নীচু ক'রে রাখে যে, টানা ভুরুর তলায় ফোলা ফোলা দুটি চোখের পাতা আর টিকোলো নাকটিই শুধু চোখে পড়ে। অদ্ভুত মাষ্টারি আমার! এরকম বোবা পড়ানো যে কি দুঃসাধ্য-সাধন তা কেবল আমিই জানি। অনেকদিন বিরক্ত হয়ে কাজ ছেড়ে দিতে চেয়েছি কিন্তু মন থেকে সায় পাইনি। মাস গেলেই কুড়িটা টাকা, অতএব লজ্জাই স্ত্রীলোকের অঙ্গের ভূষণ ব'লে নিরুপমাকে দু'বছর যাবত কেবল ক্ষমাই ক'রে আসছি। নিরুপমার ঠাকুর্দা বলেন তাঁদের নিরুর বয়স তেরো হ'লে কি হবে দেখতে সে বেজায় বড় হয়ে গেছে, যদি ভাল ছেলে-টেলে খোঁজে থাকে—আমি বলি 'নিশ্চয় নিশ্চয়', মনে মনে ভাবি ঐ বোবাকে বিয়ে করতে ব'য়ে গেছে মানুষের। এমন অশিক্ষিত লজ্জার স্তূপ নিয়ে মানুষ করবে কি? আড় চোখে চেয়ে দেখি তার মুখের ভাব কিছু বদ্‌লালো নাকি, কিন্তু আশ্চর্য্য, চোখের পাতাটি পর্য্যন্ত তার নড়ে না।

আমার নাম বিমলানন্দ। থার্ডইয়ারে উঠেই এই টিউশনিটা পেয়েছিলাম। বাপ অর্দ্ধ পয়সার মালিকও ক'রে যাননি। বিধবা মাকে নিয়ে জ্যাঠার আশ্রয়ে দিন কাটছিল। স্কলারশিপের টাকায় পড়া চলতো, এই টিউশনিটা পেয়ে হাতে স্বর্গ পেলাম। নিরুপমার বাবা সদানন্দবাবু আমার বাবাকে চিনতেন এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা জানতেন ব'লেই অবিশ্যি আমার ভাগ্য খুলেছিল। নচেৎ আমার মত

একজন যুবক যে তাঁদের মেয়ের মাষ্টারি করছে এটা ভারি আশ্চর্য্য। আমি প্রত্যেক-দিন সাড়ে ছটা বাজতেই সকালে পড়াতে যাই। গেলেই সর্ব্বপ্রথম ঠাকুর্দ্দা উঁকি দেন, তারপর আসে নিরুপমার ছোট ভাই শঙ্কর—অবশেষে হরিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত মৃদুগমনা নিরুপমা বই আর কাপড়ের স্তূপ সামলাতে-সামলাতে এসে আমার উল্টোদিকের চেয়ারে বসে। লজ্জাটা ঢোঁয়াচে, আমারও যেন চোখ তুলে তাকাতে লজ্জা করে তবু গলা-খাঁকারি দিয়ে ন'ড়ে চ'ড়ে বসি। নিঃশব্দে নিরুপমা হোমওয়ার্কের খাতাটি বার করে, আর আমি সেটা টেনে নিয়ে ভুল থাকলে শুদ্ধ করি। ততক্ষণে জানি নিরুপমা ইংরাজি বইয়ের নির্দ্দিষ্ট পাতায় চোখ ডুবিয়েছে। নির্ভুল গতিতে চলে এই নিয়ম।

আমাদের পাড়ায় আর একটি মেয়ে আছে। তার নাম সুমি, অর্থাৎ সুমিতা। এ মেয়েটি আবার একেবারে নিরুপমার উল্টো। লজ্জা-সরমের বালাই নেই, সময়-অসময়ে ছুটে ছুটে এবাড়ি আসে, আমি নিঃস্বপর জেনেও আমার সঙ্গে ফাজলেমি করে, ঘুমিয়ে থাকলে মুখে চুলকালি মেখে রাখে, পড়াশুনোর ব্যাঘাত করে এবং নাম ধরে' ডাকে। আমি কখনো-কখনো অন্যের সামনে ভারি কুণ্ঠিত বোধ করি; কিন্তু ওর সংকোচ নেই। ওর বাবার পয়সা আছে কাজেই প্রতিপত্তিও আছে। অতএব আমার জ্যাঠাইমা আবডালে অসভ্য মেয়ে ব'লে অভিহিত করেন এবং সামনে প্রশ্রয়ের সীমা থাকে না। আমার মা ওকে সত্যিই ভালবাসেন। আমার এক বোন অল্প বয়সে মারা যায়, বেঁচে থাকলে অত বড়ই হতো, হৃদয়ের এই দুর্ব্বলতার সুযোগেই সুমি আরো আপন হয়ে ওঠে মার কাছে। সুমির বয়স যাই হোক, তার সরলতা ও নিঃসংকোচ দাপাদাপি সত্যিই মমতা কাড়ে। দৃষ্টিকটু হ'লেও অনেক সময় তাকে বকতে মায়া হয়। আমার মা বলেন যত মেয়ে তিনি আজ পর্য্যন্ত দেখেছেন তার মধ্যে সুমির মত ভাল তাঁর কাউকেই লাগেনি। এমন কি নিজের মেয়ে থাকলেও ওর চেয়ে বেশী ভালবাসতেন কি না সন্দেহ। আমি ঠাট্টা ক'রে বলি নিজের মেয়েকে না হতে পারে বৌকে নিশ্চয়ই বেশী ভালবাসবে। মা হাসেন, তারপর বলেন, কপালের কথা বলা কি যায়? সুমির বাবার বিদ্যানুরাগ আছে। কথাটা খচ্ ক'রে বেঁধে মনের মধ্যে। ও, এই বুঝি মার মনের কথা। এক রবিবার দুপুরে নিরালা বুঝে খপ্ ক'রে সুমির আঁচল টেনে বলি, 'এই সুমি—'

ভুরু কুঁচকে সুমি জবাব দেয়, 'কি?'

জবাবটার মধ্যে একটুও যদি রস থাকতো!—'সারা দুপুর এরকম হুটোপুটি কর কেন?'

'তাতে তোমার কি?'

'আমার ভাল লাগে না।'

'না লাগলো তো বয়ে গেল।'—সুমি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে চ'লে যেতে চায়।

'যেয়োনা, শোন—'

'না, আমি শুনবো না।'

'কেন শুনবে না?'

'আমার ইচ্ছে।'

'না, অত ইচ্ছে আর খাটবে না—তোমার বাবা আমার কাছে অঙ্ক কষতে বলেছেন দুপুরবেলা।'

'ঈস্'—সুমি আমার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে।

আমি শক্ত ক'রে চেপে রেখে বলি, 'তোমার একটুও লজ্জা নেই কেন? আমার ছাত্রী নিরুপমা তোমার থেকে মাত্র এক বছরের বড়, সে আমার কাছে দু'বছর যাবত পড়ছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে আমার দিকে চোখ তোলেনি।'

এবার কিন্তু অতবড় নির্ব্বোধ সুমিরও আত্মাভিমানে আঘাত লাগে। ভারি আশ্চর্য্য যত বোকাই হোক বা যত সরলই হোক মেয়েরা কখনোই মেয়েদের প্রশংসা সইতে পারে না। তাই সুমির ঐ শিশুচোখেও একটু অভিমানের আভাস দেখা দেয়। বলে, 'সেকথা আমাকে বলবার হয়েছে কি?'

হেসে বলি, 'তাতে যদি তোমার একটু শিক্ষা হয়।'

'শিক্ষা?'—আচম্বিতে সুমি প্রচণ্ড এক চিম্‌টি কেটে পালিয়ে যেতে যেতে বলে, 'ওসব শিক্ষা তোমার ছাত্রীকেই শিখিয়ো, আমার সঙ্গে লাগতে এসো না।'

মার পছন্দ যে একটুও ভাল না সে-বিষয়ে এবার নিঃসন্দেহ হই। মার আসল নজর কি ঐ সুমিই না সুমির বাপ? মার মুখে অনেকদিন শুনেছি আমাকে বিয়ে দেবেন মুরুব্বি দেখে। তাঁর আইডিয়েল মুরুব্বি বোধ হয় তাহ'লে সুমির বাবাই। মার ঘরে গিয়ে দেখি সুমি আচার খাচ্ছে চেটে চেটে। শুনতে পাই, 'কাকিমা, কি সুন্দর আচার কর তুমি।' কাকিমা বলেন, 'আর একটু খাবি নাকি?' সুমি নিশ্চয়ই আরো চাইত। আমাকে দেখেই বলে, 'ঐ এসেছেন তোমার আদুরে ছেলে, —এখানে কেন, যাও না তোমার ভাল ছাত্রীর বাড়ি।'

আমি বলি, 'মা, সুমিকে আর আচার দিও না, ওকে অবিশ্রান্ত প্রশ্রয় দাও ব'লেই ও আমাকে মান্য করে না।'

'আহা রে—কি আমার 'মান্যবরেষু—'. মুখের এক অপূর্ব্ব ভঙ্গি দেখিয়ে সে আবার আচারে মনোনিবেশ করে। মুখভঙ্গি দেখে হেসে ফেলি।

দিন কয়েক পরে মা হঠাৎ বলেন, 'বিমল, এখন তো তুই বিয়ে করলেও পারিস।' বিস্মিত চোখে তাকাই—মা কি লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখেছেন না কি? আমি যেখানে নিজেই পরান্নে প্রতিপালিত সেখানে আমার অন্নপুষ্ট হবার জন্য কাউকে আমন্ত্রণ করা কি একান্তই পাগলামি নয়? মার মুখ কিন্তু হাসি-হাসি। বলেন—'কথায়-কথায় তোর জ্যাঠা সুমির সঙ্গে তোর বিয়ের কথা পেড়েছিলেন—সুমির বাবার আপত্তি নেই। ঐ তো একমাত্র মেয়ে, ভদ্রলোক তো টাকা দিতে অপারগ নন—তিনি ঠিক এই রকম ছেলেই চান যাকে নিজের মন মত গ'ড়ে নিতে পারবেন।'

'নিজের মন মত গ'ড়ে নেওয়া আবার কি?' সম্মানে ঘা লাগে কথাটায়।

'আহা, চটিস্ কেন?—অর্থাৎ টাকা-পয়সা যথেষ্ট দিয়ে বিলেত-ফিলেত ঘুরিয়ে এনে একটা হিল্লে ক'রে দেবেন আর কি।'

আজন্মের স্বপ্ন বিলেত। তবু লুব্ধতা ত্যাগ ক'রে বলি, 'ক্ষেপেছ?'

মা এবার আহত হন, 'ক্ষ্যাপার কথা কি আছে। অনেক তোর ভাগ্য রাজকন্যা আর রাজত্ব আপনা থেকেই তোর হাতে এসে ঠেকেছে, গ্রহণ যদি করিস্ তো তোরই মঙ্গল—আমার আর কি।'

উত্তরে কি বলবো ভেবে পাই না। মা আমার স্তব্ধতা লক্ষ্য ক'রে বলেন, 'আচ্ছা, ভেবে ছাখ।'

এদিকে সুমির কিন্তু ভাবান্তর নেই। আমি ভেবেছিলাম এসব কথার পরে অন্ততঃ ওর একটু লজ্জা হবে। আবার আমি নিরালা বুঝে, পরের দিন সুমি আমার তেতলার ছোট্ট ঘরে এলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার বাবা কি বলেছেন জান?'

'কি বলেছেন?'—অত্যন্ত উদ্ধত ভঙ্গীতে সে তাকালো।

'আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন।'

'অসভ্য!'

'না, সত্যি।'

'তোমার মুণ্ডু'—সুমি চ'টে যায়—'তোমার সেই ভাল ছাত্রীকে বিয়ে করো গে যাও, আমার সঙ্গে ওসব ইয়ার্কি চলবে না।' ধপ্ ধপ্ ক'রে পা ফেলে সুমি ভীষণ রেগে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

বলাই বাহুল্য, শেষ পর্য্যন্ত সুমির বাবার টাকা আমাকে জয় করলো। মাস

খানেকের মধ্যে পাকা হয়ে গেল বিয়ে। সকলেই সুমিকে নিয়ে আমাকে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে—সকলেরই ধারণা সুমিকে আমি ভালবাসি তাই এই বিয়ে। খুব এক রোমান্টিক ব্যাপার। আমি কিন্তু এখনো সুমিকে স্ত্রী ব'লে কল্পনা ক'রে একটুও আনন্দ পাই না—আগের মত সব সময় আসে না বটে, কিন্তু এলে আমার সঙ্গে দেখা হয়ই, তথাপি একথা একবারো মনে হয় না দুদিন বাদে ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে—একটু লজ্জা, একটু আনন্দ, কিছুটা নেশা, সমস্ত-কিছুর একটা মিশ্রনে হৃদয়কে অভিভূত করতে চেষ্টা করি, কিন্তু কাছে দেখলেই সমস্ত উবে যায়। তবে কি সুমিকে আমি পছন্দ করি না, ভালবাসি না? না, তাও নয় আসলে সুমির সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তাতে স্নেহ-মমতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু প্রেম নেই।

যেদিন বিয়ে তার দুদিন আগেই নিমন্ত্রণ চিঠিখানা পকেটে ক'রে নিরুপমাকে পড়াতে গেলাম। দিন কয়েক পড়াতে আসবো না একথা বলবার ইচ্ছে ছিল। পড়াশুনো শেষ ক'রে তাকিয়ে দেখলাম হরিসাধনের নির্দ্দিষ্ট বসবার স্থানটি শূন্য। চিঠিখানা অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে পকেট থেকে বার ক'রে অনেক ইতঃস্ততঃ ক'রে বললাম, 'আপনার ঠাকুর্দ্দা কি বাড়ী নেই?'

নিরুপমা মাথা নেড়ে জানালো, নেই।

'কোথায় গেছেন?'

অত্যন্ত মৃদুস্বরে জবাব এলো 'পিসিমার বাড়ী।'

'এই চিঠিখানা—' ব'লে চিঠিখানা টেবিলে রাখলাম, কিছু বলতে বড়ই লজ্জা করতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ মনে হ'ল নিরুপমা চঞ্চল হয়েছে এবং ওর শাড়ির ভেতর থেকে একখানা হাত দ্রুত বেরিয়ে এলো চিঠিখানার উপর—নিমেষে চোখ বুলিয়ে হঠাৎ মুখ তুলে এমন এক দৃষ্টি নিয়ে স্থির হয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল যে আমি খানিকক্ষণের জন্য ওর সেই অপূর্ব্ব দৃষ্টির কাছে আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম। এই প্রথম দেখলাম ওর চোখ। কি যে ছিল সেই চোখে আমি জানি না, কেন ও-কাজ করলাম তা-ও জানি না। হঠাৎ নিরুপমার হাত থেকে চিঠিখানা কেড়ে নিয়ে কুটি-কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। সাইকেলে ওঠবার আগে আর একবার পেছন ফিরে তাকালাম, দেখলাম দুই হাতে মুখ ঢেকে ও ব'সে আছে শক্ত হয়ে।

তারপর আজ! এই ভোর বেলা উঠেই আমি বিমর্ষ মুখে মাকে বলেছি, 'মা,

শেষ রাত্রের দিকে ভারি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম।' মা আজকাল সর্ব্বদাই ব্যস্ত, কি কাজে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কি স্বপ্ন ?'

'থাক, বলবো না—'

'আহা বল্ না।'

'না, শুনলে তোমার মন খারাপ হবে।'

মার কৌতূহল বেড়ে গেল। এবার বিছানায় ব'সে প'ড়ে বললেন, 'নে, নে, শীগ্‌গির বল, আমার কত কাজ।'

'বাবাকে দেখলাম—(একটু থামলাম এখানে,) উনি বললেন, "বিমল, আর ছ'মাস পরে তোকে এখানে পাব, কিন্তু আমার তাতে সুখ হচ্ছে না" (মার চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে) "তুই সংসারে থাকবি, সুখী হবি, সর্ব্বোপরি তোর দুঃখিনী মায়ের আশ্রয় হবি এই আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু যার সঙ্গে তোর বিয়ে হচ্ছে সে মেয়ের ছ'মাসের মধ্যেই বৈধব্য লেখা আছে।—"

'সর্ব্বনাশ!'—মার মুখ দিয়ে কথাটা ঠিক আর্ত্তনাদের মত বেরুলো। মুহূর্ত্তে বাড়িতে রাষ্ট্র হয়ে গেল এই স্বপ্ন—কোথায় গেল খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, আত্মীয়-কুটুম্ব—খবর গেল সুমির বাবার কাছে—বিষম ব্যাপার একমুহূর্ত্তে। আমি ফাঁক বুঝে চম্পট দিয়েছি—এবং সবেগে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছি নিরুপমাকে পড়াতে।

এখন আপনারাই বলুন, কাজটা কি আমি খুব অন্যায় করেছি ? কিন্তু নিরুপমা কেন চোখ তুলে তাকালো ?

জীবিকাবৃত্তি

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

মনের রোগ ও মানসিক অশান্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া সমীক্ষা জানাইয়াছে, মানুষের দুইটী মৌলিক প্রবৃত্তি আছে। যথা, প্রণয় প্রবৃত্তি ও মরণ প্রবৃত্তি। প্রণয় প্রবৃত্তি প্রধানত সংযোগ ও সংহতি স্থাপন ও সাধনে এবং মরণ-প্রবৃত্তি ধ্বংস ও বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত থাকে। প্রণয় প্রবৃত্তিকে কাম-প্রবৃত্তি ও আত্ম-সংরক্ষণ প্রবৃত্তিতে বিভক্ত করা এবং মরণ-প্রবৃত্তিকে উৎপীড়ন, মারণ, নির্যাতন ইত্যাদি কার্য ও তদকেন্দ্রস্থ মনোবৃত্তি আদির দ্বারা বুঝান যায়।

মানুষের কয়েক বৎসর ব্যাপি শৈশব ও বাল্যকাল এবং তদানীন্তন জীবন যাপন মানুষ-মনের প্রবৃত্তিসমূহের দাবীগুলির সহজ ও সরল পরিতৃপ্তির সুযোগ ও উপায় নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কিন্তু প্রবৃত্তিসমূহ সেই পরিমাণে পঙ্গু ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে না। বরং বিবিধ খল ও উপায়ে ব্যক্ত হইবার জন্য তৎপর, কর্মকুশলী ও চেষ্টাবান হইয়া থাকে।

এই প্রবৃত্তিসমূহ সব সময়েই নিজেদের দাবীর আদায় ও পরিতৃপ্তি প্রার্থনা করে। কিন্তু সংস্কৃতি, সমাজ, সভ্যতা ইত্যাদির দাপটে সে-প্রার্থনা সর্বদা কেন কোনস্থলেই চরিতার্থ হইতে পারে না। শিক্ষা, শাসন, আপ্যায়ন প্রভৃতি মানুষের প্রবৃত্তি-সমূহের দাবী সমুদয় সংযত করিতে সততই চেষ্টাবান। মনের যে-অংশে এই প্রবৃত্তিসমূহ বিদ্যমান তাহা মনের অধিকারীর নিজ্ঞাত। নিজ্ঞাত কিন্তু ক্ষান্ত নহে। শিক্ষা, শাসন, আপ্যায়ন প্রভৃতির চালনায় এবং সাফল্য-বৈফল্যের ফলে মানুষের একটী বৈষয়িক বুদ্ধি জন্মায়। সে বৈষয়িক বুদ্ধিকে পরিচালিত করে মনের অন্য এক অনুষ্ঠান। বিবেক সেই অনুষ্ঠানের অঙ্গ বিশেষ। এই অনুষ্ঠানটীও মনের নিজ্ঞাত অংশে অবস্থিত। কিন্তু তাহার ইঙ্গিত, নির্দেশাদি ও সেগুলির সহিত আন্তর প্রবৃত্তিসমূহের এবং বহির্জগতের বাস্তব বা বাস্তবজ্ঞানের আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্যই কর্তব্য বুদ্ধির রূপে মানুষের সংজ্ঞাত। কর্তব্যবুদ্ধিই মানুষকে জীবিকাবৃত্তির প্রতি প্রণোদিত ও উৎসাহিত করে।

উল্লিখিত প্রবৃত্তিসমূহ সুখ-সূত্রের বশীভূত অর্থাৎ সব সময়ে সুখের সন্ধান ও অ-সুখের রহিত করিতে উদ্যোগী। কিন্তু এই সুখ-সূত্রকে অতিক্রম করিয়াই মানুষের জীবিকা-কার্য। প্রত্যেক জীবিকা-কার্যের মূলেই কর্তব্যবোধ ও কর্তব্য সাধনের চেষ্টা। এতদ উদ্দেশ্যে মানুষকে কতকগুলি নিয়ম ও কঠোরতা মানিয়া লইতে হয়। মানিতে

গিয়া সুখ-সূত্রের ব্যতিক্রমও ঘটে। সুখ-সূত্রের ব্যতিক্রম ঘটিলেও পুনরায় সুখের সন্ধান অর্থাৎ সুখ-সূত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা অন্যান্য কার্যের মতই মানুষ জীবিকা অবলম্বন করে। তাই একদিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেমন প্রবৃত্তিসমূহের পরিতৃপ্তির সরল ও সহজ উপায়গুলি নিষিদ্ধ করিয়া সুখ-সূত্রের ব্যাঘাত ঘটাইল অন্যদিকে তেমনই ইহারা জীবিকাগুলিকে সুসংগত ও বিধেয় ব্যবস্থা করিয়া সেই ব্যাঘাতের প্রতিবিধান করিল। জীবিকা-কার্যের উপায়ে ও সাধনে মানুষের বহুবিধ ও বহুসংখ্যক প্রাবৃত্তিক সংতৃপ্তি ও সংভোগ জুটিয়া থাকে। শৈশবকালীন পরিবেশের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা এবং প্রাবৃত্তিক শক্তির অনুযায়ী নানা লোকের নানা সংভোগের চেষ্টা এবং সেই হেতুই নানা জীবিকা অবলম্বন ও কার্য। কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করি। তাহার পূর্বে বলিয়া রাখি, সাধারণ চোখে মনে হয়, বুঝি বা কাম-প্রবৃত্তির তৃপ্তি ও তৃপ্তির প্রথা সব মানুষের ক্ষেত্রে একই প্রকার। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সে-ক্ষেত্রেও নানা মানুষের মধ্যে নানা উপায় ও নানা প্রকারের তৃপ্তির চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কামের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে, কাম-তৃপ্তির পথ অবলম্বনে ও কাম-তৃপ্তির মাত্রা হিসাবে বিবিধ প্রথা ও ব্যবস্থা। অনেক সমাজতত্ত্ববিদ্ ও যৌনতত্ত্ববিদ্ বিনা তর্কে তাহা স্বীকার করিবে। কামের ব্যাপারে পাত্র-পাত্রীর বিভিন্ন বিচার ও তৃপ্তির বিবিধ প্রথাদির উল্লেখ করিয়া বর্তমান প্রবন্ধে ইহাই মাত্র বলা হইতেছে যে, মানুষের এই মৌলিক প্রয়োজনের দাবীসমূহ যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে অতি সরল ও সব মানুষের ক্ষেত্রে এক বলিয়া মনে হয়, সবিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক বীক্ষণে বহুবিধ ও নানা উপায়ে তৃপ্তিসাপেক্ষ। কামের ব্যাপারের মতই অর্থের প্রয়োজন ও সার্থকতা সব মানুষের ক্ষেত্রে এক নয়। জীবিকা বিষয়ে এরূপ বহুলতা রহিয়াছে, সাধারণ দর্শনে মানুষের ক্রিয়াকলাপ তাহাই বুঝাইয়া দেয়।

জীবিকাবৃত্তিকে একভাবে বিশ্লেষণ করিলে আলোচনার তিনটী ক্ষেত্র পাওয়া যায়। যথা, জীবিকা-নির্বাচন, জীবিকা-কার্যের রূপ ও প্রকার, জীবিকা-কার্যের ফল, মানে, ইহার সাফল্য-বৈফল্যের মাত্রা ও পরিমাণ। ক্ষেত্রত্রয় পরস্পর-সংবদ্ধ, মাত্র আলোচনার সুবিধার জন্যই এইরূপ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। অন্যভাবেও জীবিকাবৃত্তিকে দেখা যায়। যথা, জীবিকার উদ্দেশ্যাদি ও সেগুলির সিদ্ধি বা ভাগ্যবিপর্যয়। প্রথম বিশ্লেষণটীর পদ্ধতি কোন দেশকে বর্ণনা করিতে গিয়া সেই দেশস্থিত নদী, পর্বত, জঙ্গল প্রভৃতির উল্লেখের অনুরূপ. উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম চিত্রন অর্থাৎ দিশ-দেশমূলক (Topographical) এবং অন্যটী প্রবাহমূলক (Dynamical) অর্থাৎ কার্য-কারণ যোগাযোগ নির্দেশ করার পদ্ধতি। কোন ঘটনা বা ঘটনাসমূহকে বুঝিতে ও

বুঝাইতে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় উভয় পদ্ধতির প্রয়োগ আছে। জীবিকাবৃত্তির আলোচনায় এইরূপ বিশ্লেষণের প্রয়োজন বুঝাইতে কয়েকটী উদাহরণের উল্লেখ করি। ধরুন, কোন ব্যক্তির জীবিকাতে দেখা গেল, অধ্যয়নই একমাত্র করণীয়। এখন দেখুন এই অধ্যয়নের মূলে কতপ্রকারের উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। হয়ত সে-ব্যক্তির অধ্যয়নদ্বারা জ্ঞান অর্জন করা উদ্দেশ্য, জীবনের নানা জটিল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা। কিংবা অধ্যয়নদ্বারা নিজে জ্ঞানী হইয়া অ-জ্ঞান ও স্বল্পজ্ঞান জনসাধারণের উপর টেক্কা দিয়া প্রশংসা অর্জন তাহার উদ্দেশ্য। কিংবা জীবনের অধিকাংশ সময় অধ্যয়নে রত থাকিয়া অধ্যয়ন ব্যতীত অন্যান্য কর্ম হইতে নিজকে রহিত রাখাই একমাত্র সংকল্প। কিংবা জ্ঞানহীন অনধ্যায়ী পিতা অপেক্ষা নিজে জ্ঞানী প্রমাণ করিয়া পিতার প্রতি হিংসা ও দ্বেষকে চরিতার্থ করা অথবা পিতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিতাকে হীন প্রতিপন্ন করিয়া নিজের শ্রেয়তা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সে-ব্যক্তি অধ্যয়ন-কার্যকে জীবিকা স্থির করিয়াছে। এইরূপ কোন উদ্দেশ্য-সাধনের চেষ্টায় যেমন কোন ব্যক্তি জীবিকা-নির্বাচনে প্রবৃত্ত হয়, তেমনই উদ্দেশ্য হিসাবেই তাহার জীবিকা-কার্য নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ যদি সে-ব্যক্তি জীবিকার সাহায্যে অন্যেতরের চেয়ে নিজেকে জ্ঞানীতর বা জ্ঞানীতম প্রমাণ করিতে চায়, সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া এমন বই পড়িবে যাহা সাধারণ্যে লভ্য নয় কিংবা লভ্য হইলেও বোধ্য নয়। অতএব তাহার কার্য অন্য উদ্দেশ্য-সাধক অধ্যয়নরত জীবিকাধারীর কার্য হইতে বিভিন্ন হইবে। উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করিতে গিয়া কতটুকু সিদ্ধিলাভ তাহার পক্ষে সম্ভব তাহার উপর নির্ভর করিবে তাহার জীবিকা-কার্য। অন্যভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় প্রার্থিত সিদ্ধির মধ্য দিয়া তাহার উদ্দেশ্যের অন্য অর্থ বোধগম্য হইবে। দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে, পিতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া বিশেষ কোন বিপদ বা আশঙ্কার সম্মুখীন হওয়া যাহাতে এমন শাস্তিই তাহার ভাগ্যে জোটে যে, সে-ব্যক্তি ক্ষোভান্বিত হইয়া অবশিষ্ট জীবন দুঃখভোগ করে। অথবা পিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিপদের সম্মুখীন হইয়াও বিপদ হইতে সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া অন্য ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ফললাভ পূর্বক সুখী জীবন যাপন করে। সম্ভবত, আরও অন্য একব্যক্তি প্রলোভনাদির সম্মুখীন হইয়াও প্রলুব্ধ না হইয়া বরং নিজমনের লোলুপতার উপর বিরতি চাপাইয়া প্রমাণ করিতেছে তাহার পিতা হীনচরিত্র এবং প্রলোভনের বশেই নিজের ভাগ্যে শান্তি ও অশান্তি আনয়ন করিয়াছে। অতএব পরিশেষে সিদ্ধি বা ভাগ্য-বিপর্যয় দ্বারা জীবিকাবৃত্তি সমাপ্ত ও জীবিকা-কার্যে অভিব্যক্ত হইতেছে।

এ-প্রসঙ্গকে এখানে থামাইয়া যে-প্রসঙ্গকে ছাড়িয়া আসিয়াছি তাহাতে ফিরিয়া

আসি। পূর্বেই বলিয়াছি, মানুষের জীবিকা-কার্য মনের আদিম সুখ-সূত্রকে অতিক্রম করে। ইহার অর্থ কিছু বুঝাইয়া বলি। ছ'মাসের শিশু ক্ষুধা পাইলেই মাতৃস্তন যাচে। মায়ের কোলে শুইয়া নিজের মুখে মাতৃস্তন লাভ করিয়া ক্ষুধাতৃপ্তি অতিরিক্ত বিবিধ প্রয়োজনাদি চরিতার্থ করে। মাতৃস্তন-লাভে ব্যাঘাত জুটিলে সে-শিশু ক্রন্দনাদির দ্বারা তাহা অপসারণের চেষ্টায়, বলা যাইতে পারে, নিজের জীবিকাবৃত্তিকে সার্থক করিতেছে; ক্রন্দনাদি তাহার জীবিকা-কার্য। কিন্তু সুখ-সূত্রের প্রভাবে এই কার্য-সাধনই বয়স্ক ব্যক্তির জীবিকা-কার্যের সঙ্গে ইহার প্রভেদ। কিন্তু এমন ত হইতে পারে, সামান্য কান্না বা মায়ের পরিতোষবিধানেও মাতৃস্তনলাভ জুটিল না। তখন সে-শিশু কান্নার মাত্রা চড়াইয়া কথাইতে থাকে। পরিশেষে, কথাইতে কথাইতে শারীরিক বেদনা ভোগ করত 'নীল হইয়া' পড়ে। ক্রন্দনাদি তখনও প্রয়োজনাদি মিটাইতে জীবিকা-কার্য কিন্তু ক্রন্দনদ্বারা বেদনা দূর করিতে গিয়া তদুপরি অতিরিক্ত বেদনা চাপাইয়া তাহা সুখ-সূত্রকে ছাড়াইয়া যাইতেছে।

সাধারণ-দৃষ্টিতেই পরিলক্ষিত হয়, জীবিকা-কার্য কোথাও সহজভাবে সুখ আনয়ন করিতে পারে না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা পাইলে তখনই যদি ক্ষুধা-তৃষ্ণার তৃপ্তিযোগ্য বস্তু জুটিত এবং কামের উদ্রেক হইবামাত্র প্রার্থিত কাম-পাত্র বা পাত্রী ও কাম-সংভোগের যোগ্য সুযোগ ও ব্যবস্থা সামনেই হাজির থাকিত, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কামাদি প্রয়োজন মিটাইতে মানুষ যে-জীবিকা অবলম্বন করিত তাহা সম্ভবত সুখ-সূত্রের অধীনে সাধিত হইতে পারিত। কিন্তু তাহা অসম্ভব। কোন ব্যক্তির প্রভূত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা আছে, চেক-পত্রে সহি করা মাত্র তাহার জীবিকা-কার্য, তথাপি সুখ-সূত্রের সীমার মধ্যে সে-ব্যক্তি নিজের জীবিকাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে না। মানবিক সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষাদি মানুষের সংভোগ ও সংতৃপ্তির পথে যে-সব বাধার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রুটি সংগ্রহ করে' আদমকে ভগবানের অভিশাপের ফলস্বরূপ অবস্থার চেয়েও জীবিকাবৃত্তি-পরিতৃপ্তির বর্তমান পরিস্থিতি অতীব নিদারুণ হইয়া পড়িয়াছে।

অতি শৈশবে মানুষের মন-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতে যে-সব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ হয়, মানুষ সারাজীবন তাহার প্রভাব বহন করিয়া চলে। জটিল বিষয়কে অতি সহজ ভাষায় বলিলে বলিতে হয়, মানুষের জীবনের লক্ষ্য সুখের সন্ধান। মানুষের প্রবৃত্তি সমূহের পরিতৃপ্তিই মানুষের সুখ বলিয়া উপলব্ধি হয়।

এই প্রবৃত্তিসমূহ পরের পর মানুষের জীবনে বিকশিত হইতে থাকে। অঙ্গ পরিপুষ্টির সঙ্গে এই বিকাশের যোগ আছে। পরিবেশ, বাস্তবজ্ঞান ও প্রবৃত্তির

আপেক্ষিক শক্তি—এই তিনটী মিলিয়া বিকাশের পথ রচনা করে। বয়স্ককালে এই বিকাশ জীবিকাবৃত্তিকে অবলম্বন করে। অতএব প্রবৃত্তির উন্মেষ হইতে জীবিকাবৃত্তির পরিসমাপ্তি পর্যন্ত একটানা একটি প্রবাহ চলিয়াছে। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে এই যোগ সবসময় ধরা পড়ে না। সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না বলিয়া যে সে-যোগ নাই, ইহা যুক্তি নয়। পুকুরিণী, নদী প্রভৃতির জল বাষ্পাকারে শূন্যে গিয়া জলভরা মেঘ তৈরী করে, সাধারণ চোখে এই দুইয়ের যোগ ধরা পড়ে না। তথাপি এই বৈজ্ঞানিক সত্য অস্বীকার করা চলে না। এক ব্যক্তি বক্তৃতা দিয়া দেশের লোককে সমাজ ও লোকহিতকর কার্যে অনুপ্রাণিত এবং ব্রতী করিয়া জীবন যাপন করিতেছে। বক্তৃতা দিতে যে আনন্দ লাভ করে তাহার চেয়ে অসংখ্যগুণ তৃপ্তি পায় যখন তাহার বক্তৃতা শ্রোতাকে নিজের মঙ্গলের প্রতি সচেতন করে এবং শ্রোতা পরে বক্তার নির্দেশ অনুযায়ী নিজের মঙ্গলবিধানে প্রবৃত্ত হয়। লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল বক্তার কাছে বক্তৃতাদান গৌণ এবং মঙ্গলবিধানই মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই ব্যক্তি শৈশবে মাতৃস্তন পানে আসক্ত ছিল তাহার মাতাও শিশুকে অতি আদরে স্তন্যদান করিয়াছে। শিশুর বয়স যখন দুই বছর তখন তাহার এক ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিল। তাহার মাতা তখন বাধ্য হইয়াই প্রথম শিশুকে স্তন্যপান হইতে নিবৃত্ত করিয়া দ্বিতীয় শিশুর স্তন্যপানের ব্যবস্থা করিল। প্রথম শিশু স্তন্যপানের আনন্দ ত্যাগ করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। কান্নাকাটি, দুষ্টামি প্রভৃতি যতগুলি তাহার অস্ত্র ছিল, সেগুলির প্রয়োগে নিজের অভাব-অভিযোগের প্রতি মায়ের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিল। মাতা এ তাগিদ প্রত্যাখ্যান না করিয়া একটী আপোষ করিল। দ্বিতীয় শিশুটীকে স্তন্যদানে তৃপ্ত করিয়া ঘুম পাড়াইয়া প্রথম শিশুকে স্তনপানের সুযোগ দিতে লাগিল। প্রথম শিশুটী প্রথমে তাহার ভ্রাতার জন্মগ্রহণে অতিশয় বিরক্ত ও আশঙ্কান্বিত হইয়াছিল। ভ্রাতার প্রতি তাহার যথেষ্ট আক্রোশ এবং এমন কি তাহার মরণ-কামনাও তাহার মনে স্থান পাইয়াছে। পরে মাতার দ্বারা এই আপোষ-নিষ্পত্তি ভ্রাতার প্রতি তাহার মনোভাবকে ঘুরাইয়া অন্য চেষ্টায় পর্যবসিত করিল। মাতৃস্তনের প্রতি তাহার দাবী বজায় রহিল ও স্বীকৃত হইল। ভাই কাঁদিলে সে তখন তাহাকে নানা কথা ও শব্দ উচ্চারণে ভুলাইতে চেষ্টা করিত। কোন রকমে ভ্রাতাকে নিদ্রাভিভূত করিতে পারিলে মাতার স্তনের প্রতি তাহার দাবী উসুল হইত। মন-সমীক্ষার সাহায্যে এই দুইয়ের যোগ দেখা যায়। যে-ব্যক্তি পরবর্তী জীবনে জনহিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া জনহিতকর কার্যে ব্রতী হইয়াছে শৈশবে সে-ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির দাবী চরিতার্থ করিতে গিয়া সহোদর ভ্রাতাকে প্রাবৃত্তিক দাবীর আদায় হইতে আংশিকভাবে বঞ্চিত করিয়াছে। শৈশবের ইতিহাস

জানিলে সে-ব্যক্তির জীবিকাবৃত্তির অভিব্যক্তি বুঝিতে পারা যায়।

একমাত্র সমীক্ষাই এই যোগ ধরাইয়া দিতে পারে। সমীক্ষা মানুষের মনকে সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান এই তিন স্তরে বিভক্ত করে। এই স্তরত্রয় পরস্পর সংযুক্ত। মনের যে অংশটুকু আমাদের জানা তাহাই সংজ্ঞান; যে-অংশটুকু জানা না থাকিলেও চেষ্টার দ্বারা জানার মধ্যে আসে কিংবা কখনও কখনও আকস্মিকভাবে জানা হইয়া পড়ে তাহাই আসংজ্ঞান; এবং মনের যে অংশটুকু কখনই মনের অধিকারীর নিজের চেষ্টায় জানা হয় না তাহাই নির্জ্ঞান। নির্জ্ঞান মন যে মাত্রা জ্ঞানের বাহিরে তাহা নয়, যাহাতে তাহা জ্ঞানের মধ্যে না আসে সেই জন্য বহু প্রক্রিয়া, নিয়ম প্রভৃতির দ্বারা তাহাকে নির্জ্ঞানেই আটক রাখা হয়। জীবিকাবৃত্তির মূল এই নির্জ্ঞান মনে অবস্থিত। সেইজন্য জীবিকাবৃত্তির প্রবাহমূলক ব্যাখ্যা সমীক্ষণ-পদ্ধতি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।

সমীক্ষা জানাইয়াছে মানুষের চরিত্রগঠনের ভিত্তি শৈশবেই স্থাপিত হয়। বয়স্ককালে জীবিকা অবলম্বন করা মানুষের প্রতি সমাজের আদেশ। জীবিকার সাহায্যে অর্থোপার্জন জীবিকাবৃত্তির একটী উদ্দেশ্য। এই আর্থিক উদ্দেশ্যও সর্বক্ষেত্রে এক নয়। অর্থের প্রয়োজন ও সেই প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া এবং অর্থের ব্যবহার নানা মানবের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। অতএব জীবিকার সাহায্যে অর্জিত অর্থের পরিমাণ দ্বারা জীবিকাবৃত্তির মাপ করা চলে না। জীবিকাবৃত্তির অভিব্যক্তির সহিত জীবিকাধারীর চরিত্রের যোগ সমীক্ষা লক্ষ্য করিয়া থাকে। সমীক্ষার মতে জীবিকাবৃত্তি ও চরিত্রের সহিত মানুষের শৈশবকালীন জীবনের একটানা প্রবাহ রহিয়াছে। মানুষের প্রবৃত্তিসমূহের শক্তিই এই প্রবাহের গতির যোগান দেয়। মানুষের প্রবৃত্তি সহজ পথে চরিতার্থ না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বহু অ-ঋজু পথের সন্ধান করে। কিন্তু যখন এই সব বিভিন্ন পথ চরিত্রে স্থিতি লাভ করে তখন সে-পথগুলির সহিত প্রবৃত্তি ও প্রাবৃত্তিক সন্তোষের যোগ সাধারণ দৃষ্টিতে অনুমিত হয় না। জীবিকার প্রতি সামাজিক দৃষ্টি ও জীবিকাবৃত্তির বৈষয়িক সমর্থন এই যোগ স্থাপন ও স্থাপিত হইলে সে-যোগকে পুষ্ট করিতে সহায়তা করে। আধুনিক সমাজে ও রাষ্ট্রে মানুষের কার্যের অর্থমূল্যের প্রচলনের একটী বিশিষ্ট অর্থ আছে। বিশেষতঃ, ভারতবর্ষের লোক পুরাতন আদর্শ ত্যাগ করিয়া কেনই বা অর্থমূল্যের প্রতি ও রাজসম্মানের প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়া উঠিল তাহার বিশদ ব্যাখ্যা গবেষণার বিষয়। কিন্তু অন্য দেশের ন্যায় এদেশেও

জীবিকাবৃত্তির অভিব্যক্তি একই নিয়মের অনুবর্তী। এ দেশের মানুষের উপর দেশ, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতির প্রভাব ও তাহার ক্রিয়া অন্য দেশের মানুষের উপর সেগুলির প্রভাব মাত্র প্রকার ও রূপ-ভেদে বিভিন্ন। মানুষের মনের মূল সূত্রগুলি সব দেশ ও সমাজে একরূপ, কিন্তু সমাজ, দেশ ভেদে মনের বিকাশের কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। সেইরূপ জীবিকাবৃত্তি সম্বন্ধেও সেকথা বলা চলে।

এই প্রবন্ধে জীবিকাবৃত্তি আলোচনার জটিলতা ও দুরূহতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। জীবিকাবৃত্তির বৈজ্ঞানিক আলোচনা বিজ্ঞানীমহলে সবেমাত্র সুরু হইয়াছে। যে সব ক্ষেত্রে জীবিকাবৃত্তি বিফলতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে, সেই সব ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণার সুযোগ জুটিয়াছে। এই সব গবেষণাই জীবিকাবৃত্তি সম্বন্ধীয় তথ্য ও জ্ঞান যোগাইয়াছে। ভবিষ্যতে সেই সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

আশাপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

আশাপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

মুখবন্ধ

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

"কড়া জোলাপ আর মেয়েমানুষের মেজাজ, এ দুটো সর্ব্বদাই এড়িয়ে চলি। কেন না তাদের আরম্ভটা মৃদু, মনে সন্দেহই জাগে না, কিন্তু পরিণাম যেখানে গিয়ে দাঁড়ায় তার বিনিময়ে লটারীর প্রাইজ ছেড়ে দিতেও রাজী আছি।

"কড়া জোলাপের স্বরূপ সম্বন্ধে বাল্যকালেই চৈতন্যোদয় হয়েছিল। বড়'দের অনুপস্থিতিতে দরজা বন্ধ করে আমরা দু'ভাই মিলে দুটো সিগারেট পাকিয়ে ধরিয়েছিলাম। "মে ব্লসম্"-এর মিঠে গলা-জুড়ানো স্বাদের তারিফ করবার মত বয়েস তখন ছিল না। গোটা কয়েক টান দিতেই মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগ্‌ল আর মুখ আর ঠোঁট বিশ্রী রকমের তেতো হয়ে গেল। টেবিলের ওপর ছিল এক শিশি ক্যাষ্টর অয়েলের বড়ি। অগ্রজের প্ররোচনায় চেখে দেখা গেল মিষ্টি। মিষ্টত্বের লোভে আর সিগারেটের গন্ধ চাপা দেবার উত্তেজনায় মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছিলাম। ফলে মধ্যরাত্রে দু'ভায়ের নাড়ী ছাড়বার উপক্রম। ডাক্তার এসে অনেক কষ্টে থামিয়েছিলেন। সেই হতে হাজার শারীরিক অস্বস্তি সত্ত্বেও ও-পথে আর মাড়াই না।

"মেয়েমানুষের মেজাজ আর তার ফলাফল সম্বন্ধে যখন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছিলাম, তখন বয়েস বেড়েছে, কিন্তু পুরো দায়িত্বজ্ঞান জন্মায় নি। তা হলেও কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে স্ত্রীলোকের বিষকণ্ঠের আর তীব্র মেজাজের যা' পরিচয় পেয়েছিলাম, তাতে এটুকু বুঝেছিলাম, যার কপালে ও-রকম স্ত্রী জোটে তার জীবন কতটা দুর্ব্বিষহ। সেখানে কোনো ডাক্তারী, কোন পার্থিব প্রতীকারই নেই, এক নিজের গলায় দড়ি ঝোলানো ছাড়া।"

* * * * *

সেদিন সন্ধ্যায় অনিলের বৈঠকখানা ছিল খালি। শুধু আমিই হাতে কিছু কাজ ছিল না বলে অমন দুর্যোগেও নিত্যকার হাজিরা দিতে তার কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে আট্‌কে গেলাম। যেহেতু এমন ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি নাম্‌ল, আর কাছে-পিঠে না আছে যান-বাহন, সেহেতু বালিগঞ্জের নিরালা আভিজাত্যকে মনে-মনে অভিশাপ দিয়ে উঠতে গিয়ে আবার আসন দখল করলাম। ঘরেও আমার এমন কোন বিশিষ্টা আত্মীয়া নেই যার ভ্রূকুটি আকাশের চেয়ে ভীষণ অথবা কুটিলতর। কাজেই বসে বসে

অনিলের কথা শুনছিলাম। সেদিন তারও মেজাজ ভালো ছিল না, এবং তারি ফলে ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় ঘরের কোণে সে এক ধূমরাজ্যের অধীশ্বর হয়ে স্ত্রীলোকের মেজাজ নিয়ে মন্তব্য করে চলেছিল। আমিও অবিবাহিত, এবং নারী-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা আমার এতোই রোমাঞ্চপ্রবণ এবং অনুপলব্ধ, যে তার কথাগুলো কতকটা সন্দেহ কতকটা অবিশ্বাসের মনোভাব সৃষ্টি করছিল।

* * * * *

"বৃহৎ পরিবারের মধ্যে বাস করে অল্প বয়স থেকেই আমার সংসারের অভিজ্ঞতাটা পেকে উঠেছিল। বিশেষ করে স্ত্রীলোকের চরিত্র ও মনোভাব কত বিচিত্র, এর আভাস পেয়েছিলাম নানা খুঁটিনাটির মধ্য দিয়ে, যেখানে নাকি তাদের মনের সত্যি প্রকাশ। পুরুষের স্বভাব নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাইনি, কারণ স্বজাতি বলেই হোক্, বা জটিলতার অভাবের জন্যেই হোক্, তাদের মোটামুটি বুঝতে পারা খুব কঠিন নয়। টাইপ্‌স-হিসেবে তারা অপেক্ষাকৃত সরল, দুর্ব্বল আর হাস্যকর। কিন্তু মেয়েদের কথায় আর আচরণে, চিন্তায় আর ব্যবহারে যে বিরোধ আর নিত্যদ্বন্দ্ব, তাকে বুঝে ওঠা কঠিন বৈ কি! আবার ঠিক্ সময়ে, অনুকূল আবহাওয়ায়, একটু নজর রাখলেই তাদের মনের জটিলতম গ্রন্থি হঠাৎ খুলে যায়। যাকে দেখ্‌লে মনে হয়,—উদাসীন, নির্জ্জীব আর দুর্ব্বল, তারই মধ্যে আকস্মিক শক্তি-সঞ্চারে বিস্মিত হ'তে হয়। যাকে দেখ্‌লে অত্যন্ত রাশভারী, জবরদস্তি গৃহিণী বলে আতঙ্ক হয়, হয়ত তার মতো নীরক্তম, সরল আর আপন-ভোলা মানুষ নেই।

"স্ত্রীলোক বলেই যে তাদের স্বভাব, কথাবার্ত্তা, আর কার্য্যকলাপ আমাদের লক্ষ্য আর সমালোচনার বস্তু, তা' কিছু পরিমাণে সত্যি হলেও সবটা নয়। নিত্য সংস্পর্শের ফলে মেয়েদের সম্বন্ধে যে সশ্রদ্ধ আর রহস্যময় মনোভাব থাকে তার বিলোপ ঘটতে বাধ্য, যদি তোমার চোখ দুটি খোলা থাকে, যদি কিশোর বয়সে অথবা যৌবনের প্রারম্ভে অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ কবিতা বা সাহিত্যসেবা না করে থাকো। আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা, সেটা হ্যাভলক্ এলিস্, কিংবা ফ্রয়েডীয় দর্শনের সাহায্যে অর্জ্জন করি নি, করেছি আমাদের এই অতি-পুরাণো সমাজ আর সংসারের মধ্যস্থতায়, কেননা তারাই হলো জীবনের পয়লা নম্বরের মাষ্টার।

"আশ্চর্য্য! কতো অদ্ভুত এই মেয়েমানুষের স্বভাব আর মন! যাকে ভেবেছি ছলা-কলায় নিপুণ, হাসিতে স্পর্শে ভঙ্গিমায় চিত্তহরণই যার অনন্তব্রত, মিশে দেখেছি তার মতো নরম, প্রাণবান, উষ্ণ-কোমলতায় জীবন্ত মেয়ে আর নেই। যাকে মনে হয়েছে অস্বাভাবিক গম্ভীর, অত্যন্ত শোভন ও সংযত, জীবনে কখনো যার মাথা নীচু

হবে না পুরুষের কাছে, আপনারই দাম্ভিকতায় যে অটল, শুনেছি তার শঙ্খিনী মায়ায় কবলিত হয়েছে অনেক নিরীহ ভদ্রসন্তান, মরীয়া হয়ে সর্ব্বনাশের পথে নেমেছে। সে নিজের অচল-সূর্য্যে আঘাত করেছে পুরুষের অপার কৌতূহলকে, ঘটিয়েছে তাদের সাংঘাতিক পদস্খলন। যাকে ভেবেছি শুচি শুভ্রতায় গৌরবময়ী, বৈধব্যের নিরুত্তাপ দহনে আত্মসমাহিত, অনেক সন্তানের সেই মাতৃমূর্ত্তি কলুষিত হয়েছে গোপন অভিসারের অভাবনীয় ঘটনায়।

"কিন্তু এ তো গেল কয়েকটি খাপ্‌ছাড়া চরিত্র, কয়েকটী অসংলগ্ন জীবনের অস্বাভাবিক পরিণতি। যাকে দেখে তোমার মনে হবে, এমন নিষ্ঠাবতী, ভক্তিমতী রমণী আর নেই, যদি জান্‌তে পারো তার ইতিহাস ঠিক্ শ্রবণীয় নয়, তুমি কি করতে পারো? পতিব্রতা নারীর সেবায়, মিষ্টতায়, মধুর স্নেহ-সান্নিধ্যে হয়তো তুমি মুগ্ধ, অভিভূত হয়েছো কিন্তু তুমি যদি দেখতে পেতে, যে সন্দেহে আর ঈর্ষ্যায়, তাড়নায় আর মিষ্টকণ্ঠের শ্লেষ-উদ্‌গারে, তিনি তাঁর স্বামীর জীবন দিনের পর দিন বিষাক্ত করে দিয়েছেন, তখন তোমার কি মনে হবে?

"কিন্তু এ-কথা যাক। সাধারণ সাংসারিক জীবনে, পরিবারের তুচ্ছ নগণ্যতাতেই অনেক মেয়ের সত্যিকারের অসামান্য রূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যদি কোনো মেয়েকে বুঝতে চাও, তাকে দেখো তার আপন পরিবেশের মধ্যে; সেইখানেই তার প্রকৃত পরিচয়। যতক্ষণ না কোনো স্ত্রীলোকের হাতে তার স্বামীর টাকা ও চাবি না আসছে, ততক্ষণ তুমি তাকে চিনতে পারো না, পারবে না। তুমি যতো খুসী সে-মেয়েটীকে দেবী ভাবো, শ্রদ্ধা ও প্রীতি সমর্পণ করো,—আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার অনুরোধ,—তুমি বিচার করো তাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখে। কোথায় মেয়েদের দুর্ব্বলতা, কোথায় তাদের তেজ; কি তাদের সত্যিকারের চেহারা, কতো তীক্ষ্ণ তাদের নিষ্করুণ বাক্যবাণ আর কতো নির্ম্মম তাদের সূক্ষ্ম অপমান—এর কিছু আন্দাজ পাওয়া যায় বৃহৎ গোষ্ঠীর আজব চিড়িয়াখানায়। স্বদেশে অথবা প্রবাসে স্বামীর ঘরে একচ্ছত্র অধীশ্বরীর চরিত্র যাচাই হয় না।

"মেয়েদের সব চেয়ে তেজ তাদের সন্তান-গৌরবে নয়, তাদের স্বামির কৃতিত্বে বা ঐশ্বর্য্যে নয়। এগুলো উপকরণ, আত্মতৃপ্তির ইন্ধন জোগায় শুধু। তাদের সত্যিকারের দম্ভ ও শক্তি আহরণ করে তারা বাপের বাড়ী থেকে। শিক্ষিতাই হোক আর গ্রাম্য রমণীই হোক, আধুনিকা হোক অথবা সনাতনী প্রৌঢ়া কি বৃদ্ধা হোক, পিতৃগৃহের স্মৃতি ও বিস্তারিত উল্লেখ তাদের জীবন-যাত্রার কমা ও সেমি-কোলন। ও না হলে তাদের চলে না। পিতৃগৃহের ঐশ্বর্য্যটা হ'ল বাহ্য-অলঙ্কার; থাকলে ভালোই, তুলনা-

মূলক সমালোচনার সহায়তা করে মাত্র। আসলে তাঁর কল্পিত মাহাত্ম্যটাই মারাত্মক। এর শিকড় কতদূর মনের ও স্বভাবের শিরায় স্নায়ুতে সঞ্চারিত হয় আর কি বিশ্রী তার কার্য্যকরী শক্তি, তা ঠিক ব্যক্ত করা যায় না।

"মেয়েদের স্বভাব-শত্রু মেয়েই—বান্ধবীর হালচাল তারা সহ্য করতে পারে কিন্তু পারে না জ্ঞাতি-রমণীর এমন কি ভগ্নীর এতোটুকু ন্যায্য অহঙ্কার। সহজ কথা তাদের পরিণত হয়ে যায় কদর্থে, সত্যভাষণ দেমাকেরই নামান্তর দাঁড়ায়। পুরুষের নীচতা তারা ক্ষমা করতে পারে, তাদের কঠোরতম বাক্য নীরবে হজম করে যায়, কিন্তু কোনো মেয়ে সামান্য কথা শুনিয়ে গেলে তাদের অবিচলতা যায় খ'সে, ফুঁসে ওঠে মনের মধ্যে—শান্তি নেই যতক্ষণ না পাল্‌টা জবাব দেওয়া যায়। এবং সে মানসিক অশান্তি আর স্তব্ধ তীব্রতার অংশ নিতে হয় পুরুষের।

"তোমাকে আর একটা কথা বলি—মেয়েদের কর্ত্তৃত্ব-স্পৃহা বন্ধ্যা নারীর সন্তানকামনার চেয়ে তীব্র। অভিমান, ঐশ্বর্য্য,—এগুলো সৌখীন বিলাসের উপকরণ। কর্ত্তৃত্ব তাদের জন্মগত অধিকার, ওটা আহারের মতোই অপরিহার্য্য প্রাণবস্তু। ঐখানে আঘাত লাগলেই নিরীহ ও শান্ত মেয়ে সংসারে খাণ্ডবদাহের সৃষ্টি করতে পারে। বাপের বাড়ীতে থাকবে তাদের অপ্রতিহত দাবী; শ্বশুর বাড়ীতে অটুট থাকবে তাদের প্রভুত্ব—এই হ'ল তাদের অবচেতন ও সচেতন বাসনা। শিক্ষায় তারা হার মানতে রাজী, সচ্ছলতায় পরাস্ত হলে শুধু মন খারাপের ওপর দিয়ে যাবে—কিন্তু ভাঁড়ার আর পরিচালনার মৃদু আলোচনাও যদি অতর্কিতে কর্ণগোচর হয়, তবে সেদিনটা পুরুষের বাইরে-বাইরে কাটানোই নিরাপদ।

"যদি বলো—এতো ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হবার কি আছে? আছে বৈ কি! যদি তুমি মার খাও শেয়ারের বাজারে, অথবা য়ুনিভারসিটির গণ্ডী-উল্লম্ফনে অপ্রত্যাশিতভাবে পা'টা যায় বেধে, কিংবা কর্ম্মস্থলে তোমার যথাযথ কদর হচ্ছে না এবং কৃতিত্ব-অনুপাতে ছাগবুদ্ধি কয়েকটি লোক অনায়াসে তোমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে যাচ্ছে, তাহলে তুমি যথেষ্ট পরিমাণেই পীড়িত ও ব্যথিত হবে, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়াটা অন্যের ওপর চালাবে না নিশ্চয়ই।

"তুমি অবশ্য বল্‌তে পারো—আমার দৃষ্টিটা একচোখো রকমের তীব্র, কিন্তু পক্ষপাতিত্বের অজুহাতে তুমি আমার মন্তব্যের সত্যতাকে উড়িয়ে দিতে পারো না। মেয়ে-জাতি মাত্রই নরকের দ্বার, এরকম কথা কেবল মনুসংহিতার যুগেই চল্‌ত। তাদের শিক্ষা-দীক্ষায়, তাদের ভবিষ্যতে আমি আস্থা রাখি। কিন্তু তাদের স্বভাবগত **অসামঞ্জস্য, ত্রুটি বা অভাবের উল্লেখ করার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।**

ছেলেদের চরিত্র যে কোনো দোষ বা গলদ নেই, একথা বাতুল ছাড়া কেউ বল্‌বে না। কিন্তু তারা প্যারাসাইট্ নয়, তারা স্বাশ্রয়ী। সমাজতন্ত্রের দোহাই দিয়ো না; বিধাতার গড়নে দোষ চাপিয়ো না। পুরুষের চেয়ে মেয়েরা অনেক বেশী ছোটো কথা নিয়ে মাথা ঘামায়, আপনি ত অশান্তি ভোগ করেই, পুরুষকেও তার অংশ জোর করে চাপিয়ে দেয়। তুমি যদি বৃহত্তর গণ্ডীতেও তাদের টেনে আনো, তবুও সংস্কার আর স্বভাবগত দুর্ব্বলতা ঘোচাতে পারবে না। কোনো আইন-ই তাদের মাথা উঁচু করিয়ে দিতে পারে না,—যেহেতু তাদের অভাব-অভিযোগ দূর হয়ে গেলে কি নিয়ে তারা মাষ্টার হবে? সমাজ-সংস্পর্শে মেয়েদের তুমি শ্রদ্ধা করতে পারো—সেখানে তারা কনশ্যস। ঘরের মধ্যে দান-প্রতিদানের বালাই আছে, মিথ্যাচরণ আছে, আর সব-চেয়ে বড় কথা, আছে সাফাই আর যাচাই।

* * * * * *

এমন বাদ্‌লার দিনটা মাঠে মারা গেল! কোথায় আমার রসঘন অনুভূতিগুলো মনের কোণে উঁকি দিচ্ছিল, আর কোথায় এই বিদ্বেষতিক্ত অবিবাহিতের সত্যকল্প অপ্রিয়-ভাষণ! "এমন দিনে তারে বলা যায়" ত বটেই, এমন দিনে তারে কাছে যে চাই। কিন্তু মুস্কিল এই, হাতের কাছে আলাপী এমন মেয়ে নেই যাকে আর কিছু না হোক্ দু'টো মিষ্টি কথা কবিতার সুরে গুন্‌গুনিয়ে বল্‌লে হঠাৎ উঠে গিয়ে কোনো আত্মীয়কে ধরে আন্‌বে না! আমার হচ্ছে সেই অবস্থা যে-সময়ে মন একটা কিছু ধরতে চায়, তা' সে শাড়ীর লীলায়িত আঁচলই হোক্ অথবা অস্পৃশ্য একটা হাসির বিদ্যুৎরেখাই হোক্। বাইরে বেরুবার আগে গোটা কয়েক কবিতার লাইনও তৈরী হ'য়ে উঠ্‌ছিল—

"দিনের বেলায় তারারা কোথায় যায়?
তা'রা কি তোমার মধুর অধর পিছনে
শুচি ও শুভ্র মুক্তামাধুরী দশনে
লুকোচুরি খেলে ক্লান্ত হেসে ঘুমায়?"

কিন্তু অনিলের প্রবল বাক্য-স্রোতে তারা বিনা বাধায় ভেসে গেল। আমি নিরুপায়—কি আর ক'রতে পারি! সে এতো সিরীয়স্ হ'য়ে আমাকে বক্তৃতা দিচ্ছে যে সে-সময়ে কোনো প্রতিবাদ ক'রলে আমাকে অক্ষত দেহে বাড়ী ফিরতে হবে না। তা' ছাড়া বাল্যবন্ধু হলেও তার মনের এদিক্‌টা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিলো। অনিলের মন্তব্যগুলো এতই জোরালো যে না শুনে উপায় নেই; উপরন্তু অতিভাষণ হ'লেও তাতে সত্যের ছেঁয়াচ রয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার মতামত শুনে আমার খানিকটা অসহিষ্ণুতা, খানিকটা সন্দেহ হচ্ছিল। কিংবা হবেও বা—তার জীবনে

এমন কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, যা' একান্তই ব্যক্তিগত ও আমি তার কিছুই জানি না। তবু সভয়ে মোড় ফেরাবার জন্যে বল্‌লাম—"স্ত্রী-বিদ্বেষীর মন্তব্য আংশিকভাবে সত্য হয়, কিন্তু—

"কিন্তু-টিন্তু নয়; তুমি এর কিছুই বোঝো না। জীবনে কখনো একটী মেয়েরও স্বভাব ও কথাবার্তা বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করোনি; সেইজন্যেই তোমার মনোভাব অত্যন্ত জোলো ও ফিকে রোমান্টিক্। আশা করি তুমি সুখী হবে, কেন না মেয়েদের মতো কাউকে জড়িয়ে ধরতে পারাতেই তোমার সার্থকতা। তুমি ভবিষ্যতে রোমান্টিক্ কবিতা লিখ্‌তে থাকবে, কিন্তু পৌরুষ বিদ্রূপ তোমার ধাতে নেই। তুমি কাঁদবে আর সাধ্‌বে—তোমার বৌ হাস্‌বে আর তোমাকে একটা অসহায় সম্পত্তিবোধে সাজিয়ে-গুজিয়ে আলমারীতে চাবি-বন্ধ রাখ্‌বে। কিন্তু সে কথা যাক্—আমি এতক্ষণ যে ব'কে মরলুম, তার কারণ আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় খসড়া করা। স্ত্রী-জাতির সম্বন্ধে আমার অন্য মতামতও আছে কিন্তু সেগুলো এতই সূক্ষ্ম রকমের ও মনো-রাজ্যের যে তুমি তাতে অবৈধ প্রশ্রয় পাবে আর মাসিকের পাতা ভরাবে। তবে আমি ইন্দ্রিয়বাদী স্ত্রী-বিদ্বেষী নই; আমি দেহাত্মবাদী। কিন্তু কতকগুলো নিরীহ মেয়েকে কে যেন ক্ষেপিয়ে তুলেছে,—আশঙ্কা করছি স্কোনো ভিক্টোরীয়ান্ নিষ্কলা মহিলা। ফলে এমন একটা উগ্র কাগজ বা'র করেছে আর বিশুদ্ধ ননসেন্স্-ভর্ত্তি পুরুষ-কুৎসা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হচ্ছে যে একটা থীসিস্ লেখা দরকার হয়েছে। তাই এই নিরালা অবসরে তোমার মত পাথুরে-বুদ্ধির ভাবপ্রবণতায় আমার মন-শানানোর জরুরী তাগিদ্ ছিলো। কিন্তু কথা হচ্ছে আমার থীসিস্ ছাপবে কে, দেখ্‌বে কে? তোমার কবিতার কল্পিতা নায়িকারা?"

* * * *

এই স্মরণীয় সন্ধ্যার পর অনেক দিনের ব্যবধান। অনিল সনাতন হিন্দুমতে চোখ বুজে ঢিল ছুঁড়েছে এবং আবহমান কালের শিক্ষায় আর ঐতিহ্যে পরিপুষ্টা গৃহিণীকে নিয়ে আপাতসুখে কালক্ষেপণ করছে। আর আমি—হঠাৎ-দেখা একটি মেয়েকে নিয়ে দিনকয়েক হাবুডুবু খেয়ে অপর একজনকে বিবাহ করেছি যার পিছনে এতোটুকু ইতিহাস নেই। সে আমার কবিতা কখনো শোনে কখনো শোনে না—আমি তবু লিখি, কেন না এখনও ভাবতে ইচ্ছে করে যে আমার পাশে যেন একটি মেয়ের নিবিড় সঙ্গ অস্পষ্টভাবে অনুভব করছি। মসৃণ শঙ্খের মতো যার ললাটে বিদ্রোহী অলকগুচ্ছ নীল ছায়ার মায়া রচনা করছে—বিস্রস্ত অঞ্চল—বিস্তৃত চাঁদিনী রাতের আকাশের ওপর দিয়ে ভেসে যায় তার চাহনি—বিস্ময়-বিস্ফার, কৌতুকচঞ্চল।

কোমল-শিথিল মুঠি, সুঠাম দেহশ্রী। নিঃশ্বাস ফেলে চমকে উঠি—বেদনা-বিলাসিতায় নতুন কবিতা পুরাণো ধাঁচে লিখি, আমার স্ত্রী সেগুলো ব্যক্তিগত স্তবোচ্ছ্বাস ভেবে আমার কাব্যপ্রতিভা স্বীকার করেন। অনিল কিন্তু সত্যিই কবিতা লিখতে সুরু করেছে যদিও একথা পূর্ব্বে কল্পনাও করতে পারতাম না। সবাই নাকি বলছে, তার কবিতা দুর্ব্বোধ্য কিন্তু সেইজন্যেই অপরূপ ও দুঃসাহসী; বিদ্রূপের ফলায় আর ব্যঙ্গের উত্তাপে বাঙলা ভাষায় নাকি এক নতুন খড়্গকাব্যের সূত্রপাত হয়েছে।

* * * * *

কী কুক্ষণেই বিবাহের পরে সেই সন্ধ্যার কথা কোনো এক অলস-দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে স্ত্রীর কাছে গল্প করেছিলাম। অনিলের সমস্ত মন্তব্য শুনে আমার স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন—কী সাংঘাতিক! যদিও তার বিবাহ হয়েছে এবং তার মতামত হয়তো বদলে গেছে এমন আশ্বাস আমার স্ত্রীকে অনেকবার দিয়েছি কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট হ'য়ে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে এমন বন্ধুত্বের সংস্পর্শ তিনি সহ্য করবেন না—তার প্রভাব আমার পক্ষে রীতিমত ক্ষতিকর। অনিল যদি মদ্যপ দুশ্চরিত্র হতো তা হ'লে তাঁর এতো ভাবনার কারণ ছিল না, কিন্তু স্থিরবুদ্ধি ইন্‌টেলেক্‌চুয়ল বলেই তাঁর বিশেষ আপত্তি। অনিলের স্ত্রী সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর অবজ্ঞা, তার মামা সেরেস্তাদ্দর, বাবা সওদাগর আফিসের ছোটো কেরাণী।

অনিলের সেদিনকার মন্তব্যগুলো মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে যায়। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম স্ত্রীকে—"আচ্ছা, স্বামীর কাজে-কর্ম্মে, তার চিন্তাধারায় যদি স্ত্রীর সহানুভূতি না থাকে তা হ'লে কি ক'রে দাম্পত্য-জীবন সুখের হয়? তুমি তো এতোটুকু দেখোও না আমি কি করি, কি ভাবি...."

আমার স্ত্রী বললেন—"পুরুষ বুদ্ধিমান সাহচর্য্য যদি চায়, তার বিয়ে করা মোটেই উচিত নয়, মনোমত বন্ধু খুঁজে নিয়ে তার সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে বাস করা উচিত। স্ত্রীর কাছে যা পাবার তাই পেলেই হলো। সব সময়েই তো তোমার মুখে মুখ দিয়ে সহানুভূতি জানাতে পারি না। তা ছাড়া তোমাদের রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন জানো তো....? স্ত্রীর কাছে দরদ বা সহানুভূতি যদি মেলে তো ভালোই—সেটা সোনায় সোহাগা—উপরি পাওনা ব'লে। যদি ভালবাসাই পেয়ে গিয়ে থাকো, তা হ'লে খাঁটি সোনা নিয়ে তৃপ্তি হওনা কেন, শুধু সোহাগার জন্যে এত মিথ্যে ক্ষোভের দরকার?"

আশ্চর্য্য মেয়েদের অন্তর্দৃষ্টি! তবু সন্দেহ ঘুচল না—বললাম—"কিন্তু কী

ক'রে হদিস্ পাবো, সে সত্যিই ভালোবাসে কি না"

আমার স্ত্রী অবাক হ'য়ে আমার দিকে বড় বড় করে তাকালেন, তারপর আচমকা হেসে উঠে চুম্বন-প্রকরণের একটা জলন্ত নমুনায় আমার একেবারে মুখবন্ধ করে দিলেন।

* * * * *

আজকাল আমার মনে আর বেশী-কিছু দ্বন্দ্ব জাগে না। আমার স্ত্রী ক্ষুদ্রতম সমস্যারও নির্ভুল সমাধান করে দেন। মেয়েদের সংস্কারক-প্রবৃত্তি খুব প্রবল ও কার্য্যকরী, কেন না তিনি আমাকে মনোমত ছাঁচে ঢালাই করে নিয়েছেন। আমি নিশ্চিন্ত আরামে তাঁরই নির্দ্ধারিত পথে চলেছি। কবিতা অবশ্য এখনও লিখি তবে আর ছাপি না, যেহেতু আমার স্ত্রী বলেছেন অনিলের প্রবর্ত্তিত কাব্যধারার যুগ নাকি শীঘ্রই শেষ হবে—তারপরে আস্‌বে, আস্‌বে আমার বিজয়মাল্যের মাহেন্দ্রক্ষণ।

সমাজতন্ত্রবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি

বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের কলেজী পাঠ্যপুস্তক মারফৎ সমাজতন্ত্রের যে আলোচনা শিক্ষিত মহলে পরিচিত তাহা সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া যাঁহারা সমাজের নানাবিভাগে নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত তাঁহারা সময়াভাবে বা উৎসাহের অভাবে অতি পুরাতন কয়েকটা বাঁধা বুলিদ্বারা সমাজতন্ত্রবাদকে উড়াইয়া দিতে চান। কখনও বা তাহার চেয়ে অসঙ্গত ভুলও করেন সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদকে এক বলিয়া ধরিয়া লইয়া। হয় এ্যারিষ্টট্‌ল্-এর প্লেটোর "রিপাব্লিকে"র দুষ্ট আলোচনা বা রাশিয়া সম্পর্কে "প্রপাগ্যাণ্ডা" পড়িয়া—সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ ও ষ্ট্যালিনের রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থার বিকৃতরূপকে একই মনে করেন।

এই মনোভাব তরুণ সমাজের মনে এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে বাধ্য। একদিকে, মহাত্মা গান্ধী সমাজতন্ত্রবাদের পাল্টা হিসাবে তাঁহার চরকার-ভিত্তিতে নয়াসমাজের রূপ গ্রহণযোগ্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চান (কয়েক মাস পুর্ব্বে ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার পত্রের উত্তরে "হরিজন" পত্রিকায় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। দুর্ভাগ্যবশতঃ চরকাযুগ প্রবর্ত্তন সম্ভব কিনা এ তর্ক ছাড়িয়া দিলেও যে রামরাজ্য ও বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের সামঞ্জস্য তিনি কল্পনা করেন, তাহা ভরসা মাত্র, আকাঙ্খা মাত্র—বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্মত নয় (যদিও তাঁহার ভাষ্যকার গ্রেগ সাহেব ও কুমারাপ্পা তাহা করিতে অসফল প্রয়াস পাইয়াছেন)। অন্যদিকে, চেম্বার অব কমার্সের সভা হইতে স্কুলের প্রাইজ বিতরণে ধনিকতন্ত্রের উৎসাহী সমর্থকগণ সমাজতন্ত্রবাদের কাছাকাছি আলোচনামাত্রকেই নানাদোষদুষ্ট বলিয়া বারে বারে বলাতেই বুঝি নিষিদ্ধ ফলের প্রতি মায়া বুঝিয়া এবং বেশী না বুঝিয়াই বাড়িয়া উঠিয়াছে।

যাঁহারা সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথায় আস্থাবান এবং উহাকে সামাজিক ও নৈতিক কারণে বর্ত্তমান ব্যবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার প্রতীক বলিয়া আদরও করেন, তাঁহারা টাওসিগ্ প্রমুখ "প্রাচীন"দের অর্থনৈতিক সমালোচনাকে অনেকাংশেই স্বীকার করেন।

অধুনা এ বিষয়ে আলোচনার এক প্রচণ্ড আবর্ত্ত অর্থনৈতিক ধুরন্ধরদের মধ্যে হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে আজ জোর করিয়া বলা সম্ভব হইয়াছে যে রাশিয়ার

দৃষ্টান্তদ্বারা নয়, অর্থনৈতিক গবেষণা ও মত-বিশ্লেষণের পর সমাজতন্ত্রবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ়।

প্রকৃতপক্ষে মার্কস্‌ও সমাজতন্ত্রের দৈনন্দিন ব্যবস্থার আলোচনা করেন নাই। রাষ্ট্রক্ষমতা সম্পর্কিত সম্যক্ ব্যবস্থার পর যথারীতি সময়োপযোগী ব্যবস্থা হইবে—ইহা হয়ত সমাজতন্ত্রবাদের প্রবর্ত্তকদের মনের তলায় ছিল। অন্য কারণ বোধ হয় এই যে জগৎকে মতবাদের যাথার্থ্য প্রমাণে ও সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যায় তাঁহাদের মন প্রচুরভাবে ব্যস্ত থাকিত। আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় * এ সম্বন্ধে আলোচনা পড়িয়াই আমার এই নিবন্ধ। তাহাতে মুখবন্ধে অধ্যাপক লিপিন্‌কট্ (Lippincott) বলিতেছেন যে প্রাচীনপন্থী অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যেই কেহ কেহ সমাজতন্ত্রবাদ আলোচনার এই অভাবপূরণে অগ্রসর হইয়াছেন। এ সম্পর্কে তিনি ইটালিয়ান পণ্ডিত প্যারেটোর (Pareto) উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে তিনিই দেখান যে অর্থনীতি শাস্ত্রের সাধারণ্যে গৃহীত বিশ্লেষণ ধণিকতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র দুইয়েতেই প্রযোজ্য। প্যারেটোর পরবর্ত্তী অনেকে এ বিষয়ে তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এ যুগের বিলাতি অর্থনীতিবিদ্‌দের শীর্ষস্থানীয় অধ্যাপক পিগু (Pigou) সেদিন তাঁহার Socialism versus Capitalism (সমাজতন্ত্রবাদ বনাম ধনিকতন্ত্রবাদ) পুস্তকে যে অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে অনেকেই তাঁহাদের পুরাণো পুঁথি ফেলিয়া দু'চারখানা নূতন আলোচনার বই ও নিবন্ধ পড়িয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পিগুর মতে নিছক বৈষয়িক ব্যবস্থার উৎকর্ষের (economic technique) নিক্তিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধনতন্ত্রের অপেক্ষা গ্রহণযোগ্য। "থিওরী" বা বিশ্লেষণের দিক হইতে ভাল হইলেও পিগু বলেন যে, তাঁহার ব্যবহারিক সীমাবদ্ধ জ্ঞান হইতে মনে হয় যে সমাজতান্ত্রিক নেতাদের কার্য্যক্ষেত্রে নানা সমস্যার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

গত শতাব্দীর শেষাংশে ইংলণ্ডে জনৈক লিবারেল অর্থসচিব বলিয়াছিলেন যে যে-সময়েই সকলেই মত ও কার্য্যে সাধারণভাবে সমাজতন্ত্র-বিশ্বাসী ("We are all Socialists"—Sir William Harcourt)। তিনি বোধ হয় বলিতে চাহিয়াছিলেন যে কলকারখানার যুগে বিত্তহীন শ্রেণীগুলি আইনের সাহায্যেও সরকারের নেক্‌নজর ভিন্ন মানুষের সাধারণ অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত হইতে বাধ্য। সমাজের দুরন্ত ও স্ফীত অঙ্গগুলিকে আয়ত্তাধীনে আনাকেই তিনি সরকারের পক্ষে সমাজতন্ত্রের পোষকতার

*On the Economic Theory of Socialism (Papers by Oskar Lange & Fred Taylor) Edited by Benjmin Lippincott (University of Minnesota Press. 1938.)

সামিল মনে করিয়াছিলেন। আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে নিরঙ্কুশ স্বার্থ-ও-লাভের সাধনার বিরুদ্ধে সমাজ জর্জ্জর এবং বিভিন্নরূপে সমাজের সুষ্ঠুমন ইহার প্রতিরোধের চেষ্টা করিতেছে :—রুজভেল্টের "নিউ ডীল," মুসোলিনী ও হিটলারী রাজত্বে ধনিকের লাভের সীমা-নির্দ্ধারণ, সোভিয়েটের অর্থনৈতিক-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ইহার নানা অভিব্যক্তি। তফাৎ এইখানে যে সমাজতন্ত্রী মূল-ব্যবস্থার অদলবদল চায় এবং অন্য জোড়াতালিকে নিরর্থক মনে করে।

সমাজতন্ত্রবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হওয়াতে ভরসা আছে, ভাবনাও আছে। ভরসা এই যে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে যে আতঙ্কের ছবি চিত্রিত হয়, যে বিশৃঙ্খলার ভবিষ্যদ্বাণী ধ্বনিত হয়, তাহা অমূলক হইলে সমাজতন্ত্রসম্পর্কে অনভিজ্ঞের শান্তিতে দিন গুজরান সম্ভব হয়। ভাবনা এই যে যাঁহারা নেতৃস্থানীয় ও শিক্ষাভিমানী তাঁহাদের উপর দায়িত্ব আসে সমাজতন্ত্রবাদকে মাথা খাটাইয়া যাচাই করিবার এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখিবার যে দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী উহার রূপ কি হওয়া উচিত। ওয়েব-দম্পতির Soviet Communism (সোভিয়েট সাম্যতন্ত্র)-এর মত প্রাঞ্জল হইয়ে মত, বিশ্লেষণ ও সুনিপুণ সমালোচনায় রাশিয়ার যে নবকলেবরের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইতে শিখিবার, জানিবার ও ভাবিবার অনেক আছে : যেমন শিক্ষা ও সাধারণ মূল্যের পরিমাণ আছে রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি"তে। কিন্তু আমরা কয়জন পড়ি? আর কয়জন জানিয়া, বিচারতর্কের ভিত্তিতে ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে আমাদের মনকে গড়িয়া তুলি চারিদিকের স্রোতের সহজ আকর্ষণ হইতে নিজেদের সংহত রাখিতে?

আর্থিক জগতের প্রাত্যহিক চালচলনের অন্তরালে যে ভবিষ্যৎ পুনর্গঠন ও নবরূপের অপেক্ষায় ইসারা করিতেছে তাহার সন্ধান প্রতি বুদ্ধিমান নাগরিকের পক্ষে অবশ্যই করা উচিত : সেই উদ্দেশ্যেই এই নিবন্ধের অবতারণা।

লীলা চাঁটুনীশ

বম্বে টকীজের 'আজাদ' চিত্রে অপূর্ব অভিনয় করেছেন

শ্রীমতী রেণুকা

বম্বে টকীজের আগামী সামাজিক চিত্র 'নয়া সংসার'-এ অবতীর্ণ হয়েছেন

লীলা দেশাই

নিউ থিয়েটার্সের 'নর্ত্তকী' চিত্রে নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন

চলচ্চিত্র

এ-দেশের স্টুডিয়ো-সংবাদ

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

দেবকী বসু পরিচালিত এঁদের নতুনতম ছবি 'নর্ত্তকী'র হিন্দী-সংস্করণ ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে মুক্তিলাভ করেছে। ··· বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের সংশ্লেষে জনৈকা নর্ত্তকী এবং এক সুদর্শন ব্রহ্মচারী যুবকের প্রেমের কাহিনী এই চিত্রের বিষয়বস্তু।···'চিত্রা'য় বাংলা-সংস্করণ 'নর্ত্তকী'র মুক্তি-তারিখও বিজ্ঞাপিত হয়েছে। বাঙলা-সংস্করণে অভিনয় করেছেন লীলা দেশাই, ভানু ব্যানার্জ্জী, শৈলেন চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, ইন্দু মুখার্জ্জী, কমলা প্রভৃতি। 'নর্ত্তকী'র সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন পঙ্কজ মল্লিক।

মতিমহল থিয়েটার্স

মতিমহল থিয়েটার্সের 'নিমাই সন্ন্যাস' উত্তরা চিত্রগৃহে কয়েকদিন হ'ল মুক্তিলাভ করেছে।··· আলোচ্য চিত্রের কাহিনী গড়ে' উঠেছে শ্রীচৈতন্যের জীবন-কথা থেকে এবং নিমাইকে যথাসম্ভব বাস্তব মানুষরূপেই চিত্রিত করা হয়েছে।··· ছবিখানি পরিচালনা করেছেন ফণী বর্ম্মা। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও গান রচনা করেছেন অজয় ভট্টাচার্য্য। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, মণিকা দেশাই, নিভাননী, রবি রায়, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।

ফিল্ম কর্পোরেশন

উদীয়মান পরিচালক সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় এঁদের নবতম বাংলা সামাজিক চিত্র 'প্রতিশোধ'-এর চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হয়েছে। 'প্রতিশোধ'-এর কাহিনী রচনা করেছেন বিখ্যাত কথাশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র।

পরিচালক প্রফুল্ল রায় সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। প্রকাশ, এই মাসের শেষাশেষি তিনি তাঁর ছবির কাজ সুরু করবেন। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনার ভার পেয়েছেন।

এঁদের হিন্দী চিত্র 'চিত্রলেখা'র চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন কেদার শর্মা। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন নেহতাব, নান্দ্রেকার, মণিকা দেশাই, রাজেন্দ্র প্রভৃতি।

মুভি টেকনিক

হীরেন বসুর পরিচালনাধীনে মুভি টেকনিক সোসাইটির 'কবি জয়দেব' চিত্রের কাজ সমাপ্তির দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।··· জয়দেবের জীবনের নাটকীয় পরিবেশ ও তাঁর দার্শনিক অনুভূতির রোমাঞ্চিত আখ্যায়িকা আশ্রয় করেই মুভি টেকনিক সোসাইটী 'কবি জয়দেব' চিত্র তুলছেন। নাম-ভূমিকায় হীরেন বসু এবং অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে নরেশ মিত্র, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙুলী, রাণীবালা, চিত্রা, রেবা বসু, নিভাননী প্রভৃতি অভিনয় করছেন।

ওয়াদিয়া মুভিটোন

এঁদের ত্রিভাষী চিত্র 'রাজনর্ত্তকী'র চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। একটি জমকালো মিছিলের দৃশ্য তুলে মধু বসু সদলবলে বরোদা থেকে বোম্বে ফিরে এসেই ছবির সম্পাদনার প্রতি মনোনিবেশ করেছেন।··· মণিপুর রাজকুমার এবং রাজনর্ত্তকীর প্রেম ও বিরহকে কেন্দ্র ক'রে যে রসায়িত কাহিনী গ্রথিত হয়েছে, পরিচালনার কৃতিত্বে ও অভিনয় নৈপুণ্যে পর্দায় তা সুষমামণ্ডিত ও সার্থক হয়ে উঠবে—সকলেই আশা করেন।··· নাম-ভূমিকায় সাধনা বোসের লীলায়িত নৃত্য ও অভিনয় এবং পুরোহিত কাশীশ্বরের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর জীবন্ত চরিত্র-চিত্রন ছবিখানির প্রধান আকর্ষণ। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন প্রতিমা দাশগুপ্তা, প্রীতিকুমার, বিভূতি গাঙুলি, জ্যোতিপ্রকাশ প্রভৃতি। 'রাজনর্ত্তকী'র বাঙলা-সংস্করণ শীঘ্রই 'উত্তরা' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

ন্যাশানেল ষ্টুডিও

বীরেন্দ্র দেশাইয়ের পরিচালনাধীনে বম্বের ন্যাশন্যাল ষ্টুডিয়োর পরবর্ত্তী চিত্র 'রাধিকা'র চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। 'রাধিকা'র শ্রেষ্ঠাংশে অবতীর্ণা হয়েছেন কুমারী নলিনী জয়ন্ত নাম্নী জনৈকা নবাগতা। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন হরিশ, জ্যোতি, সুনলিনী দেবী, বীণা কুমারী প্রভৃতি।

দ্রষ্টব্য :—অনিবার্য কারণে 'ঝড়ের আকাশ' (ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাস)-এর শেষাংশ এ-সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হ'লনা। আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

শ্রীযুত বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'সমাজতন্ত্রবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি' শীর্ষক প্রবন্ধটী 'আর্থিক জগৎ' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

সম্পাদক : বিরাম মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চৌধুরী, কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

১৩নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড হইতে প্রকাশিত ও ১২২, বৌবাজার ষ্ট্রীটের 'আর্থিক জগৎ প্রেস' হইতে মুদ্রিত। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : বিরাম মুখোপাধ্যায়

ব্ল্যাকআউট